মধ্য যুগের সভ্যতা

4632/69
10

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII. Vide Notification No. TB/VII/H/81/69 dated 8.1.81

মধ্যযুগের সভ্যতা

[সপ্তম শ্রেণী]

কৌশাম্বীনাথ মল্লিক এম. এ. (ইতিহাস) এম. এ. (শিক্ষাবিজ্ঞান)
ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান, বেহালা কলেজ। ভূতপূর্ব অধ্যাপক, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, হেতমপুর কলেজ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, বেলুড় শিক্ষণ মন্দির।

জয়দুর্গা লাইব্রেরী
৮এ কলেজ রো : কলিকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসে মধ্যযুগ

মানব সভ্যতার ইতিহাসকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হয়—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। ইউরোপের ইতিহাসে গ্রীস ও রোমের ইতিহাস নিয়ে প্রাচীন যুগের কারবার। আমাদের দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে গুপ্তযুগের শেষ পর্যন্ত কালকে প্রাচীন যুগ বলা হয়। অনুরূপভাবে চীন, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশগুলির ইতিহাসে প্রাচীন যুগের সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের সমাজ দাসদের শ্রমের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

'মধ্যযুগ' কথাটির অর্থ হ'ল 'দুটি যুগের মধ্যবর্তী যুগ'। যে যুগকে মধ্যযুগ বলা হয় সে যুগের লোকেরা কিন্তু তাদের যুগকে মধ্যযুগ বলত না। তাদের নিকট সে যুগ ছিল বর্তমান যুগ। যাঁরা মধ্যযুগ কথাটি ব্যবহার করেছেন তাঁরা হলেন পরবর্তীকালের অর্থাৎ আধুনিক যুগের মানুষ। তারা নিজেদের যুগকে বড় করার জন্য তাদের পূর্ববর্তী যুগকে ছোট করে দেখেছেন।

প্রাচীন যুগ শেষ হয়ে মধ্যযুগ শুরু হয়েছে কবে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) সময় থেকে ইউরোপে মধ্যযুগের শুরু বলে ধরা হয়। এই যুগটি স্থায়ী হয়েছিল প্রায় এক হাজার বছর। পনেরো শতকে ইউরোপের ইতিহাসে যখন মধ্যযুগ সম্পূর্ণ বিদায় নেয়নি তখন থেকেই আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠতে থাকে। নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, নতুন সংস্কৃতি ও নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপে সর্বপ্রথম দেখা দেয়। ফলে মধ্যযুগের রূপান্তর ঘটে।

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রধান হল খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রতিষ্ঠান বা চার্চের প্রভাব। মধ্যযুগের জনসাধারণের ওপর চার্চের প্রভাব ছিল অসীম। তারা যাজকদের কথা অমান্য করতে পারত না। এই যুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল পবিত্র রোম সাম্রাজ্য এবং তার সম্রাট। সম্রাটের পদটি ছিল সম্মানজনক। এর দ্বারা বিভিন্ন রাজাদের মাথার ওপরে একজনকে বসাবার চেষ্টা চলে। অর্থাৎ ইউরোপ যে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য নিয়ে গঠিত তা না ভেবে এক খ্রীষ্টান সভ্যতার পীঠস্থান রূপে বাস্তবে পরিণত করতে চাওয়া হয়েছিল। মধ্যযুগের তৃতীয় ও শেষ বৈশিষ্ট্য

হল সামন্ত প্রথা। এই সামন্ত প্রথার সংগঠিত সমাজের ছবিই হচ্ছে মধ্যযুগের সমাজের ছবি।

মধ্যযুগের শেষে নতুন সংস্কৃতি, নতুন সমাজ, নয়া অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকায় ইউরোপে এক নতুন সমাজের উদয় হয়। এই সমাজের মানুষ যুক্তি দিয়ে সবকিছু প্রশ্নের সমাধান করতে চাইল। ধর্মের বা যাজকদের নির্দেশে সে তার জীবন পরিচালিত করতে চাইল না। এই সমাজে বণিক, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের নিয়ে এক শক্তিশালী শ্রেণী গড়ে ওঠে। ফলে নতুন সমাজে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতাও লোপ পেল।

নতুন সমাজের এই শক্তিশালী শ্রেণী কেবল ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ব্যস্ত রইল না, মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় বহু তত্ত্বের চর্চা শুরু করে স্বাভাবিক, সুস্থ ও আনন্দময় জীবন-যাপনের জন্য তারা নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলল।

নতুন সমাজে সামন্তদের ক্ষমতা কমে যায়। বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ক্রমে এদের হাতে সমাজের উৎপাদনের শক্তিগুলি চলে যায়। ফলে উৎপাদনের সম্বন্ধও বদলাতে শুরু করে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি আর যুগের দাবি মেটাতে পারল না। এর বদলে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠল তাকে বণিক যুগ বা পুঁজি সংগ্রহের যুগ বলা হয়।

এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত ও সফল করবার জন্য নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠল। দেখা দিল জাতীয় রাষ্ট্র। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় বন্ধুত্ব ও একতাবোধ ত্যাগ করে নিজ নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালিত করতে থাকে। ফলে মধ্যযুগের অখণ্ড খ্রীষ্টান সভ্যতার ধারণারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভারতে মধ্যযুগ। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ভারতে মধ্যযুগ শুরু হয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে। পশ্চিম ইউরোপে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল অনেকটা অনুরূপ অবস্থায় ভারতে মধ্যযুগের সূচনা হয়। এই অবস্থা হল কেন্দ্রীয় শক্তির পতন। এর পর ভারতে যে সব রাজ্য গড়ে ওঠে সেগুলির সর্বভারতীয় রূপ ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক রূপই সেগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভারতে অবশ্য পঞ্চম শতকের শুরু হতেই সমাজে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকালেই মহাসামন্তদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। রাজার নিজস্ব জমিতে যারা চাষ-আবাদ করত তাদের উৎপাদিত শস্যের এক মোটা অংশ রাজাকে দিতে হত। রাজকর্মচারীরাও এই সময় জমিদারী বা জায়গীর পেত। গুপ্তযুগের পর এই ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হয়। মুঘল যুগে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটে। অতএব মোটামুটিভাবে

ইউরোপ ও ভারতে মধ্যযুগ প্রায় (৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) এক হাজর বছর স্থায়ী হয়েছিল।

ইতিহাসে যুগ বিভাগ। ইতিহাসে কোন যুগকেই সময়ের বা বছরের গন্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না। ইতিহাসের গতি মন্থর হলেও এর গতিতে কখনো ছেদ পড়ে না। যেমন মধ্যযুগের সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল ভূমিদাস প্রথা। এই ভূমিদাস প্রথা গড়ে ওঠে দাসপ্রথা হতেই। প্রাচীন যুগের শেষের দিকে জমিদাররা দাসদের ছোট ছোট জমির মালিকানা ও সেগুলি চাষ করার অধিকার দিয়েছিল। বিনিময়ে দাসরা প্রভুর জন্য ফসল আলাদা করে রাখত এবং প্রভুর নিজস্ব জমিতে বছরে বেশ কিছুদিন বেগার খাটত। এইভাবে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি রচিত হয়। সুতরাং ইতিহাসে কোন যুগই পরস্পর সম্পর্কহীন নয়। যাঁরা ইতিহাসকে কয়েকটি সুস্পষ্ট যুগে ভাগ করেছেন তাঁরা নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ীই করেছেন। যেমন ইংরেজরা মধ্যযুগের সমাপ্তি ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল বলে মনে করেন। এই বৎসর টিউডর বংশের শাসনকাল শুরু হয়। অনেকে আবার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের বছরটি (১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্যযুগের অন্তিম কাল বলে গণ্য করেন। আবার অনেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতনের সময় থেকে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের শুরু বলে ধরেছেন।

বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগ বিভিন্ন সময়ে শুরু হয় বলে আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ইউরোপে যেমন মধ্যযুগের শুরু পঞ্চম শতকে এবং অবসান পঞ্চদশ শতকে, ইউরোপের বাইরের দেশগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু এটি খাটে না। আজ পৃথিবীতে এমন দেশ রয়েছে যেখানে এখনও সামন্ততন্ত্র টিকে রয়েছে। এইসব দেশে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ইউরোপের তুলনায় অনেকদিন বেশী টিকে ছিল। এমনকি রাশিয়ায় মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ভূমিদাস প্রথা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। অথচ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি হতে এই ব্যবস্থার বিদায় ঘটেছিল অনেক আগেই।

সুতরাং একথা বলা যায় যে, মধ্যযুগের শুরু ও শেষ সব দেশে একই সময় হয় নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এর শুরু ও সমাপ্তি ঘটে। স্থান ও কাল হিসেবে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলির রকমফের লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপে মধ্যযুগ

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই বিস্তৃত ছিল। এই সুবিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের যে পতন হতে পারে তা মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু যা ঘটবার তাই ঘটল। এই প্রবল প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের পতন ঘটল ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

পতন ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘটলেও রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে তৃতীয় শতক হতেই। সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল রোমের শত্রুরা। এই শত্রুরা হল হূন ও জার্মান উপজাতিগুলি। জার্মানদের রোমানরা বর্বর বলত। এরা রোমান ছিল না বলেই রোমানরা এদের বর্বর বলত। খ্রীষ্টীয়
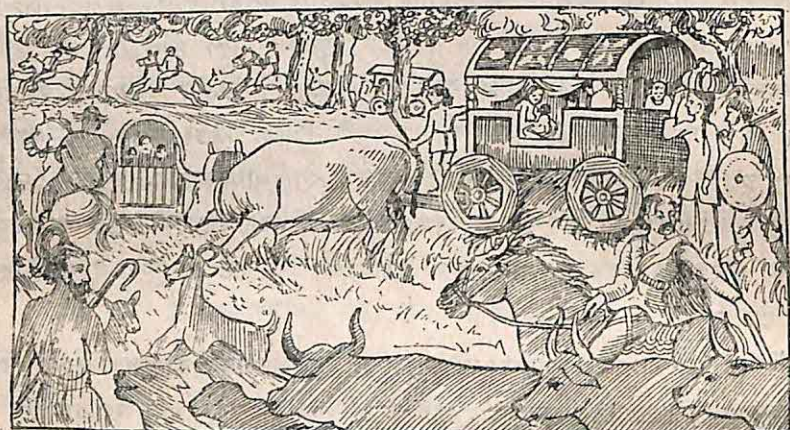
জার্মান উপজাতিদের বসতি পরিবর্তন

প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে উত্তর ইউরোপের রাইন, দানিয়ুব ও ভিশ্চুলা নদী এবং বাল্টিক ও উত্তর সাগর বেষ্টিত ভূভাগে এরা বসবাস করত। এরা যাযাবর ছিল ন, কিন্তু এক স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করত না। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে তারা প্রায়ই বসতি পরিবর্তন করত। এজন্য তারা রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে চলে যেত। কোন কোন জার্মান উপজাতি ইটালী ও রোম সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বসবাস করতে শুরু করে। রোম সাম্রাজ্যে এই জার্মান উপজাতিদের প্রবাহ প্রায় দু'শ বছর ধরে চলেছিল।

জার্মানদের সঙ্গে রোমানদের এইরকম সম্পর্ক বেশী দিন টিকলো না। এই সময় এক সাংঘাতিক বিপদ দেখা দিল। হূন নামক এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে ইউরোপে প্রবেশ করতে থাকে। তাদের আদি নিবাস ছিল মধ্য এশিয়া অঞ্চলে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে তারা ইউরোপে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে। তারপর চতুর্থ

শতক হতে তারা রীতিমত আক্রমণ শুরু করে। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল থেকে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তারা কৃষ্ণ সাগরের উপকূল ভাগের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় তারা পূর্বগথদের (অস্ট্রোগথ) বাসস্থান দখল করে নেয়। পূর্বগথদের কিছু অংশ বাধ্য হয়ে পশ্চিম গথদের (ভিসিগথ) বাসস্থান দখল করতে থাকে। পশ্চিম গথদের নেতারা রোম সম্রাটের নিকট আশ্রয় চায়। রোম সম্রাটরা তাদের আশ্রয় দেন। দানিয়ুবের পশ্চিম তীরে থ্রেস ও মোয়েসিয়া প্রদেশে পশ্চিম গথরা বসবাস করতে শুরু করে। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কনস্টাণ্টিনোপলকে কেন্দ্র করে বাইজানশ্টিয়াম নামে পরিচিত রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে টিকে রইল। অপরদিকে সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ অভ্যন্তরীণ সংকটের ফলে ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়াল।

রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে জার্মানদের আক্রমণ ও রাজ্য স্থাপন

ভিসিগথ নেতা এলারিক-এর রোম আক্রমণ। রোম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ পশ্চিম গথদের নেতা এলারিক পুরোপুরি কাজে লাগালেন। তিনি ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আক্রমণ করে রোম নগরী অবরোধ করেন। বাধ্য হয়ে রোমানরা সন্ধি করতে চাইলো। প্রচুর ধনরত্নের বিনিময়ে এই সন্ধি হতে পারে বলে এলারিক জানালেন।

বর্বর জাতির রোম আক্রমণ

রোমানরা এলারিকের এই প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিছুদিনের মধ্যে এলারিক পুনরায় রোম আক্রমণ করলেন। রোমান ক্রীতদাসরা রাজধানী প্রবেশের দরজা খুলে দেয়। তিনদিন তিনরাত্রি ধরে এলারিক তাঁর সৈন্যদের নিয়ে রোম লুণ্ঠন করেন এবং মূল্যবান সমস্ত জিনিসপত্র বোঝাই করে দেশে ফিরে যান।

বর্বর জাতিদের আক্রমণ ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন
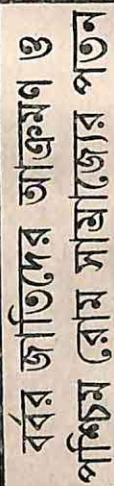
গথনেতা এলারিকের রোম লুণ্ঠনের অনেক আগে হতেই কিন্তু জার্মান জাতির অন্যান্য শাখা রাইন নদী পার হয়ে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে এবং স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। এই সমস্ত জার্মান উপজাতি বার্গাণ্ডিয়ান, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, জুট, এঙ্গলস্ ও স্যাক্সনস্ নামে পরিচিত। গলের (ফ্রান্সের) দক্ষিণ-পূর্বে বার্গাণ্ডিয়ানরা বসতি স্থাপন করে। স্থানটির নাম হয় বার্গাণ্ডি। ভ্যাণ্ডালরা প্রথমে স্পেনে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু পশ্চিম গথরা এই অঞ্চলে এসে স্পেন হতে ভ্যাণ্ডালদের বিতাড়িত করে। ভ্যাণ্ডালরা জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে কার্থেজ সমেত আফ্রিকার রোমান প্রদেশগুলি দখল করে বসবাস করতে থাকে। ফ্রাঙ্করা রাইন নদীর দক্ষিণ দিকের উত্তরাংশে বসবাস করত। রোম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তারা গল (ফ্রান্স) আক্রমণ করে দখল করে নেয়। তাদের নাম অনুসারে দেশটির নাম হয় ফ্রান্স। পশ্চিম গথরা স্পেনে প্রায় তিনশ' বছরের অধিক কাল রাজত্ব করেছিল। এঙ্গলস্, জুট ও স্যাক্সনরা বৃটেন অধিকার করে নেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হঠাৎ হয়নি, বরঞ্চ পতন হবার পূর্বেই এটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর ঠিক এই দুর্দিনে আর এক বিপদের সম্মুখীন হয় পতনোন্মুখ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য।

হুন-নেতা এটিলা। হুন জাতি তাদের নেতা এটিলার নেতৃত্বে পূর্বে ক্যাস্পিয়ান সাগর হতে জার্মানীর রাইন নদীর তীর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে অধিকার বিস্তার করে। হুনরা ছিল ধ্বংসবিলাসী। রোমান এবং জার্মান উপজাতিগুলি তাদের ভয়ে কাঁপত। এটিলা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে দানিয়ুব নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর রাজধানী হতে বের হয়ে ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স আক্রমণ করলেন। পথে নগরে নগরে লুণ্ঠনের পালা চলতে থাকে। এই মহাসংকটে জার্মান উপজাতিগুলি রোমানদের সহিত একজোটে এটিলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। চ্যালন বা ট্রয়ের যুদ্ধে উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই হয়। এই যুদ্ধে উভয়দিকের প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু এটিলার জয় হল না। পরাজয়ের

এটিলা

পর এটিলা সাময়িকভাবে রাইন নদী পর্যন্ত সরে যান। কিন্তু পরে আবার তিনি ইটালী আক্রমণ করেন (৪৫২ খ্রীষ্টাব্দ)। সমগ্র ইটালীতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শেষে খ্রীষ্টান ধর্মগুরু পোপের অনুরোধে এটিলা রোম লুণ্ঠন না করে ফিরে যান। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয়।

ভ্যাণ্ডাল নেতা জেনসেরিক। এটিলার মৃত্যুতে কিন্তু রোম রক্ষা পেল না। হূনদের পর ভ্যাণ্ডালরা রোম আক্রমণ করে। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডাল রাজ জেনসেরিক কার্থেজ থেকে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে ইটালীতে লুণ্ঠনকার্য চালাতে থাকেন। পোপ তার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে রোম নগরী ধ্বংস না করতে অনুরোধ করেন। জেনসেরিক তাঁর কথা উপেক্ষা করে রোম নগরী ধ্বংস করলেন এবং যা কিছু সম্পদ পেলেন তা লুণ্ঠন করে নিজ দেশে ফিরে যান।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান। ভ্যাণ্ডাল আক্রমণের পর রোম সম্রাট সৈন্যবাহিনীর হাতে খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়ালেন। গথ সৈন্যরা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাদের নেতা ওডোসেয়ারকে ইটালীর রাজা বলে ঘোষণা করল এবং শেষ রোমান সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাসকে তাড়িয়ে দিল। এইভাবে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান হল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটেছিল।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও রোমান সভ্যতার অবদান ইউরোপের মানুষ ভুলতে পারল না। এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তাদের মনে যে ধারণা রয়ে গেল সেটা হল কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা, শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির ধারণা। পরবর্তী কালে এই ধারণাই বাস্তবে রূপ দেবার জন্য বিভিন্ন দেশের নৃপতিরা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

জার্মানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন

জার্মান উপজাতিগুলির মধ্যে পরিবারই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। কয়েকটি পরিবার নিয়ে তৈরী হত মার্ক, ডফ বা গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামের স্বাধীন লোকদের নিয়ে 'মুট' নামে একটি সমিতি থাকত। প্রথমে জার্মানদের মধ্যে কোন রাজা ছিল না। এক একটি উপজাতির অন্তর্গত লোকেরা তাদের নেতা নির্বাচন করত। নেতার প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল তাদের চরিত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক অবস্থা। জার্মানদের সমাজে নারীর স্থান ছিল মর্যাদাপূর্ণ। গৃহকর্ম ছাড়াও তারা বাইরের কাজে পুরুষদের পাশে থেকে সমান মর্যাদা ও অধিকারে কাজ করে যেত। জার্মান নারীরা ছিল যেমন পরিশ্রমী তেমন সাহসী।

জার্মান জাতিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রামেই থাকতে ভালবাসত। বসবাস করবার জন্য তারা শহর গড়ে তোলেনি। অতএব তাদের সভ্যতাকে গ্রামীণ সভ্যতা বলা যায়। শস্য ও পশুচারণ খেতের মধ্যে গড়ে উঠতো একের পর এক সুন্দর গ্রাম। আমরা যাকে খড়-ছাওয়া মাটির ঘর বলি জার্মানদের ঘরগুলি ছিল ঠিক সেইরকম। খড়ের চালের মাথায় একটা ফোকর থাকত ধোঁয়া বেরোবার জন্য। ঐ অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত হত বলে ঘরে কোন জানালা থাকত না। গ্রামের চারিদিকে থাকত লম্বা ও মজবুত কাঠের বেড়া। যেখানে শত্রুর ভয় বেশী সেখানে পাথরের পাঁচিল থাকত। পরিধান হিসাবে অধিকাংশ লোক চামড়া ব্যবহার করত। খুব শীতের সময় পশমের পোশাক তারা ব্যবহার করত। মাছ ধরা, শিকার করা, বলদে টানা লাঙল দিয়ে চাষ-আবাদ করাই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। গম, যব ও অন্যান্য খাদ্যশস্য তারা উৎপাদন করত। শিকার ও যুদ্ধে তারা ঘোড়া ও রথ উভয়ই ব্যবহার করত। তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর, ধনুক, বর্শা, তরবারি, ঢাল। তারা মাথায় শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত আত্মরক্ষার জন্য। যুদ্ধ তাদের নিকট ভয়ের জিনিস ছিল না। বরং যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে আসাকে তারা ঘৃণা করত।

ধর্মমত। জার্মানরা বহু দেবদেবীর উপাসক ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিই ছিল

জার্মানদের দেবদেবী। লোকি, ফ্রিয়া (পেছনে), ওড্‌ন্, টিউ।

তাদের দেব ও দেবী। আকাশের দেবতা ছিলেন ওড্‌ন্‌, পৃথিবীর দেবতা হার্থা, বজ্রের দেবতা থর, যুদ্ধের দেবতা টিউ, সূর্যদেবী সুন্না, অগ্নির দেবতা লোকি, চন্দ্র-দেবতা মানি এবং উৎপাদনী শক্তির দেবী ফ্রিয়া। জার্মানদের দেবদেবীর নাম থেকে ইংরেজীতে সপ্তাহের দিনগুলির উৎপত্তি হয়েছে।

জার্মান উপজাতিদের সরল ও স্বাধীন জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবে তাদের কর্মঠ, তেজস্বী, অসমসাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় করে তুলেছিল। এসব চারিত্রিক গুণ তাদের উন্নত-তর সভ্যতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। কালক্রমে তারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু গ্রহণ করে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

তৃতীয় অধ্যায়

"অন্ধকার যুগের" ইউরোপ

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইউরোপে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অনেকে অন্ধকার যুগের সূচনা বলে মনে করেন। মোটামুটিভাবে এই অন্ধকার যুগের সময়সীমা হল চতুর্থ হতে সপ্তম শতকের শেষ পর্যন্ত। ইউরোপের তিনশ' বছরের ইতিহাসকে অন্ধকার যুগ বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে। রোমান সাম্রাজ্যের ধারণা সাধারণ লোকের নিকট এতই উঁচু ধরনের ছিল যে তারা রোমান শাসন বলতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন বলে মনে করত। রোমান জগৎ ছিল শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগণ্য। অপরদিকে জার্মান জাতিগুলির শাসন সম্বন্ধে তাদের মনে কোন উঁচু ধারণাই সৃষ্টি হয় নি। জার্মান জাতিগুলির আইন-কানুন, আচার-ব্যবহারকে তারা নীচুস্তরের বলে মনে করত। এমনকি সম্রাট শার্লেম্যান নিরক্ষর ছিলেন এবং জার্মান উপজাতিদের অন্যান্য রাজারাও ঠিক সভ্য ছিলেন না। তাঁদের সঙ্গে জুলিয়াস সিজার বা রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের তুলনাই চলে না।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয় তার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় দেখা দেয়। জার্মানদের আক্রমণে রোমান যুগের অপূর্ব শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবসান ঘটে। অপরদিকে জার্মানরা তখনও আদিম জীবন যাপন করত এবং কায়িক শ্রমের সাহায্যে তাদের প্রয়োজনগুলি মেটাতে না পেরে যুদ্ধকেই তারা একমাত্র উপায় বলে মনে করেছিল। তারা ইউরোপের যে অঞ্চলে নিজেদের অধিকার স্থাপন করে সে সব অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের চরম অবনতি ঘটে। স্বভাবতঃই অনেকে এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলে মনে করেছিলেন।

অন্ধকার যুগ বলা যায় না। বর্তমানে তথাকথিত অন্ধকার যুগের বহুকিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এমনকি কয়েকজন ধর্মযাজক এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে খুঁটিনাটিভাবে লিখে গেছেন। এই যুগেই খ্রীষ্টান মঠগুলিতে যাজকরা প্রাচীন সভ্যতার কালজয়ী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য সযত্নে রক্ষা করে গেছেন। মঠগুলিই ছিল বিদ্যাচর্চার স্থান এবং জ্ঞানের যে ক্ষীণ আলোটুকু সেখানে অনির্বাণ রাখা হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। এই যুগে রাজশক্তির কোন সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি ছিল না। শিক্ষার যে কোন প্রয়োজন আছে তাও শাসকশ্রেণী মনে করত না। খ্রীষ্টান চার্চ ও মঠগুলি এই যুগে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। এই যুগে হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সাধু জেরোম এ কাজটি করেন। সাধু অগাষ্টিনও একজন সুলেখক ছিলেন।

খ্রীষ্টান চার্চের অবদান। চতুর্থ থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে খ্রীষ্টান চার্চ সুসংগঠিত হয়। আমব্রোজ, জেরোম ও অগাষ্টিন নামক ধর্মযাজকরা এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে চার্চ জনসাধারণের মনে নীতিবোধ জাগিয়ে তাদের সভ্য জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। কিছুদিনের মধ্যে বিজয়ী জার্মান জাতিগুলি চার্চের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার নিকট মাথা নত করে এবং খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ফলে চার্চ নির্দেশিত নৈতিক আদর্শের জয় হয়।

পাপপুণ্যের ধারণা। চার্চ এই যুগে যীশুখ্রীষ্টের বাণী প্রচার করে জনসাধারণের মনে পাপপুণ্যের ধারণা জাগাতে কিছুটা সফল হয়। চার্চ প্রচার করে যে ঈশ্বরের রাজ্যে সকলেই ভাই ভাই। ঈশ্বর সকলের পিতা। তিনি অশেষ দয়ালু। তিনি পাপকে ঘৃণা করেন। কিন্তু অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষমা করেন। যারা পাপ স্বীকার করে আর অনুতাপ করে পাপমুক্ত হয় তারাই ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে। তাদের আত্মা পবিত্র হয়। এদের নিয়েই ঈশ্বরের রাজ্য। সকলে যদি হিংসা, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি ত্যাগ করে, সকলে যদি সকলকে ভালবাসতে পারে তবেই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। চার্চ আরও প্রচার করে যে পাপ কাজ করলে তার শাস্তি পেতে হবে। তবে পৃথিবীতে সকল পাপীর শাস্তি হয় না। তা যদি হত তাহলে শেষ বিচারের কোন প্রয়োজন ছিল না। নরক এবং শয়তান উভয়েই সনাতন। ঈশ্বরের কৃপা হলে অনেক পাপী নরক ভোগ হতে অব্যাহতি পেতে পারে। আর যারা পায় না তাদের দেহ অনন্তকাল ধরে পুড়তে থাকে, কখনো ভস্ম হয় না। এই নরক ভোগের ব্যবস্থা দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং মুক্তি দ্বারা তাঁর করুণা প্রমাণিত হয়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব। চার্চের এই প্রচারের ফলে পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হবার সুযোগ পায়। ধর্মযাজকরা জনসাধারণের মধ্যে যীশুর বাণী এমনভাবে প্রচার করতে লাগলেন যার ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসতে থাকে। বিচার ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তাকে ব্যক্তিগত দিক হতে বিচার না করে সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক হতে বিচার করার ব্যবস্থা হয়। অপরাধ নির্ণয়ের জন্য যে সব অমানুষিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়।

চার্চের প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে ওঠে তার ফলে লোকেরা তাদের পূর্ব রীতিনীতি পরিত্যাগ করে সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে লাগল। সমাজে অধিকতর শৃঙ্খলা ও ঐক্য দেখা দিল। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের শিক্ষায় অনেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে মঠবাসী হলেন। তাঁরা বিদ্যাচর্চায় ও ধর্মালোচনায় জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। পরবর্তী কালে বহু ইউরোপীয় মনীষী এইসব মঠে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
বাইজাণ্টাইন সভ্যতা

রোম সাম্রাজ্যের সুবর্ণ যুগের অবসান ঘটে ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরও সাম্রাজ্য বহুদিন টিকে ছিল। এই সময় খ্রীষ্টধর্ম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এটা কিন্তু রোম সম্রাটগণ ভাল মনে করেন নি। ফলে খ্রীষ্টানদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে। কিন্তু অত্যাচার চালিয়েও রোম সাম্রাজ্যে এই ধর্মের প্রসার রোধ করা গেল না। অবশেষে রোম সম্রাটগণ বুঝতে পারলেন যে খ্রীষ্টধর্মকে উপেক্ষা না করে একে কাজে লাগাতে পারলে তাঁদেরই সুবিধা হবে। ফলে খ্রীষ্টানদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হল। এই রোম সম্রাটরা খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখালেন। অবশেষে সম্রাট কনস্টাণ্টাইন এই ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি ২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় সহনশীলতা অনুমোদন করেন এবং নিজে এই ধর্মে দীক্ষিত হন। খ্রীষ্টান চার্চ তাঁকে 'মহান' উপাধিতে ভূষিত করে।

সম্রাট কনস্টান্টাইন

কনস্টাণ্টাইন ছিলেন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাট। তিনি রোম সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখবার জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা নেন। এগুলির মধ্যে প্রধান হল বসফোরাস উপকূলে অবস্থিত বাইজেণ্টিয়াম নামক স্থানে রোম সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন। তাঁর সম্মানার্থে এর নামকরণ হয় 'কনস্টাণ্টিনোপল'। এই সময় রোম সাম্রাজ্য বিপুল আকার ধারণ করে। তখনকার দিনে রোম নগরী হতে এই বিরাট সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে শাসন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে রাজনৈতিক কেন্দ্রটিকে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে স্থানান্তরিত করে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। কনস্টাণ্টাইনের রাজত্বকালে রোম সাম্রাজ্য কিন্তু অটুট ছিল। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিয়োডোসিয়াস রোম সাম্রাজ্যকে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। এক পুত্রকে দিয়ে যান পশ্চিম সাম্রাজ্য এবং আর একজনকে পূর্ব সাম্রাজ্য। এই পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় কনস্টাণ্টিনোপল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে রোম সাম্রাজ্য

পূর্ব ও পশ্চিম
রোম সাম্রাজ্য
৩৯৫ খ্রীঃ
জার্মানী
গল
ইটালী
স্পেন
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য
রোম
কার্থেজ
আফ্রিকা
ভূমধ্য সাগর
ডাসিয়া
থ্রেস
কনস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ সাগর
পূর্ব রোম সাম্রাজ্য
আর্মেনিয়া
এথেন্স
স্পার্টা
এন্টিয়োক
সিরিয়া
জেরুজালেম
আলেকজান্দ্রিয়া
মিশর
রোম সাম্রাজ্য সীমা
দুই সাম্রাজ্যের সীমা

বলতে তখন বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যকে বোঝাত। একে অবশ্য পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বলা হত।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হলেন জাস্টিনিয়ান (৫২৭—৫৬৫ খ্রীঃ) তিনি ৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন পুরোপুরি রোমান সম্রাট। সমগ্র রোম

সপরিষদ সম্রাট জাস্টিনিয়ান

সাম্রাজ্যই তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল, তিনি কখনো খণ্ডিত রোম সাম্রাজ্যের কথা ভাবেন নি। সুতরাং সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। এ কাজে তিনি কিছুটা সফলও হয়েছিলেন।

ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব তিনি বেলিসেরিয়াস নামে এক প্রতিভাশালী সেনাপতির ওপর দেন। বেলিসেরিয়াস প্রথমেই ভ্যাণ্ডালদের পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকা পুনর্দখল করেন। তারপর ইটালী হতে গথদের তাড়িয়ে দিয়ে ইটালী পুনরুদ্ধার করেন। সবশেষে দক্ষিণ স্পেনের কিছু অংশ থেকে ভিসিগথদের হটিয়ে দেন। ৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম জয় করেন।

জাস্টিনিয়ানের সাম্রাজ্য
অ্যাংলো-স্যাক্সন
স্যাক্সন
প্যারিস
ফ্রাঙ্ক রাজ্য
লোম্বার্ড
ভিসিগথ রাজ্য
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
রোম
ভূমধ্য সাগর
সিসিলি
কার্থেজ
কনস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ সাগর
পারস্য (সাসানীয় সাম্রাজ্য)
এন্টিওক
সাইপ্রাস
ক্রীট
আলেকজান্দ্রিয়া
মিশর
জাস্টিনিয়ান কর্তৃক বিজিত অঞ্চল

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য জাস্টিনিয়ান পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করতে না পারলেও জার্মান উপজাতিদের ওপর প্রতিশোধ নিতে তিনি সক্ষম হন। জাস্টিনিয়ান পশ্চিমী দেশ জয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে পূর্বদিকে পারসিকরা তাঁর সাম্রাজ্য ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। পারসিকদের সঙ্গে তিনি সুবিধা করতে পারেন নি। তাদের তিনি ধনরত্ন দিয়ে আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন।

আইন সংহিতা প্রণয়ন। সম্রাট জাস্টিনিয়ান কেবলমাত্র যুদ্ধ জয় করেই ক্ষান্ত হন নি, সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য তিনি দিনরাত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর প্রধান কীর্তি হল 'কর্পাস জুরিস' বা রোমান আইন সংহিতা প্রণয়ন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোম সাম্রাজ্যে বহু আইন সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলি রোমানদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এগুলিকে রোমান সভ্যতার চিরস্থায়ী অবদান বলে মনে করা হয়। জাস্টিনিয়ান এইসব আইনগুলি সংগ্রহ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে এই আইন সংহিতা রচনা করান। এই কাজের জন্য তিনি দশজন বিখ্যাত আইনবিদের উপর দায়িত্ব দেন। এক বছরের মধ্যেই মূল সংহিতা বা 'কোড'-টি প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে পাওয়া যায় সম্রাটদের সৃষ্ট আইনগুলি। একে তিনি বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের আইন বলে ঘোষণা করেন। এর পর আইন সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এটিকে 'ডাইজেস্ট' বলে। এতে রোম সাম্রাজ্যের প্রখ্যাত আইনবিদ্‌দের বিভিন্ন আইনের ধারা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও মতামতগুলিকে স্থান দেওয়া হয়। বিচারকদের পক্ষে এগুলি মেনে চলা অবশ্য-কর্তব্য বলে তিনি ঘোষণা করেন। সবশেষে প্রকাশিত হয় 'ইন্‌ষ্টিটিউট' নামক গ্রন্থটি। এতে রোমান আইন কিভাবে ও কেন রচিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা আছে।

আইন সংহিতায় সম্রাটকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। আইনের চোখে দাস ও স্বাধীন নাগরিকের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। সমাজে নারীরা যাতে সম্মানজনক স্থান পায় তার ব্যবস্থা করা হয়। কন্যাও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে বলে উল্লেখ করা হয়। সমাজে অনাচার দূর করবার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য বিনাবিচারে বেশিদিন আটক রাখাকে বে-আইনী কাজ বলে গণ্য করা হয়। জাস্টিনিয়ানের সংহিতা মানুষের চিরকালের সম্পদ। পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশের আইন রচনাকে এই সংহিতা প্রভাবিত করেছে। এজন্য তাঁকে 'সভ্য সমাজের আইন প্রণেতা' বলা হয়।

স্থাপত্য কীর্তি। জাস্টিনিয়ান কনস্টাণ্টিনোপলকে জগতের শ্রেষ্ঠ শহর ও রাজধানী হিসেবে তৈরী করতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন রোম শহরের চেয়েও যাতে এ শহর অধিক

সৌন্দর্যময়ী ও গৌরবের অধিকারী হয় তার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে কনস্টাণ্টিনোপলে এক মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। এর ফলে রাজপ্রাসাদ হতে শুরু করে সেণ্ট সোফিয়া গির্জাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর জাস্টিনিয়ান কনস্টাণ্টিনোপলকে নিজের মনের মত করে গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করেন। ইতিহাসে এরূপ নির্মাণকার্যের উদাহরণ বিরল।

রাজধানীতে তিনি সিনেট সভা শ্বেতপাথর দিয়ে পুনর্নির্মাণ করেন এবং বিরাট স্নানাগারটি নতুন করে তৈরি করে জনপ্রবেশের পথ আরও প্রশস্ত করেন। ফলে রোমের বিখ্যাত স্নানাগারের চেয়ে এটি আরও সুন্দর হয়। রাজপ্রাসাদও অতি সুন্দরভাবে সাজান হয়। তাঁর নির্মাণকার্য কেবলমাত্র রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দুর্গ, প্রাসাদ, মঠ, গির্জা ও তোরণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত হয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল নতুন সেণ্ট সোফিয়া গির্জা। এটিকে কোন সেণ্ট বা সন্তের নামে উৎসর্গ
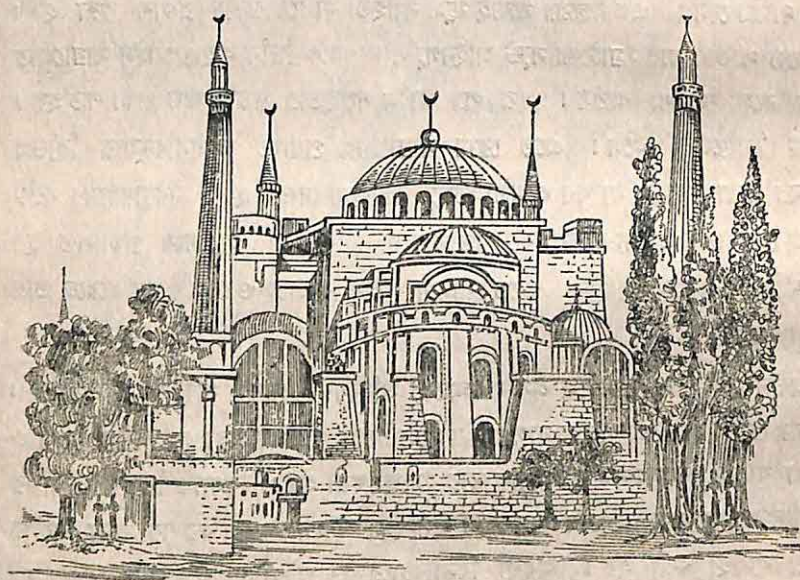
সেন্ট সোফিয়া গির্জা

করা হয় হয় নি, উৎসর্গ করা ঈশ্বরের নামে (হেজিয়া সোফিয়া)। দশ হাজার কর্মী প্রায় ছ'বছর ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে এই অতুলনীয় স্থাপত্য শিল্পের নির্মাণ-কাজ শেষ করে। কথিত আছে জাস্টিনিয়ান নিজে সাধারণ পোষাকে দিনের পর দিন শ্রমিকদের ৎসাহ দেবার জন্য উপস্থিত থাকতেন। এই গির্জা নির্মাণে খরচ হয়েছিল প্রায় এক

হাজার কোটি টাকা। মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ, রৌপ্য দিয়ে এর অভ্যন্তরীণ কারুকার্য সম্পন্ন করা হয়। সেন্ট সোফিয়া জাস্টিনিয়ানের অবিনশ্বর কীর্তি। এ ছাড়া সাম্রাজ্যের তিনি আরও ২৪টি গির্জা নির্মাণ করান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই নির্মাণকার্যের উন্মাদনা চলেছিল। আমাদের সবচেয়ে বিস্ময় লাগে যে, পশ্চিম ইউরোপে যখন অন্ধকার যুগ চলছিল ঠিক সেই সময়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল।

চিত্রশিল্প। জাস্টিনিয়ান ভাস্কর্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদার ছিলেন। সে যুগে সাধারণতঃ গ্রন্থের অলঙ্করণের জন্যেই অধিকাংশ ছবি আঁকা হত। চিত্রাঙ্কণের বর্ণাঢ্যতার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। আইন গ্রন্থের চিত্রনে এটি লক্ষ্য করা যায়। সে যুগে বই ছিল মহামূল্যবান। বই-এর মলাট হতে শুরু করে প্রতিটি পাতা চিত্রিত করা হত। এ ছাড়া 'মোজেইক' ছিল চিত্রশিল্পীদের প্রতিভা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। প্রতিকৃতি অঙ্কনে মোজেইক ব্যবহার করা হত। শিল্পীরা কোন সুন্দর জিনিস আঁকবার পর সেটি সোনা, রূপা বা মূল্যবান পাথর দিয়ে সাজাতেন। জাস্টিনিয়ান তাঁর প্রাসাদ ও বিভিন্ন গির্জার দেওয়াল শিল্পীদের ছবি দিয়ে সাজিয়েছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে বাইজান্টিয়াম বা কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপলের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে শত্রুদের পক্ষে শহরটি জয় করা তখনকার দিনে প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রায় আশি কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর দিয়ে এই শহরটি ঘেরা ছিল। সুরক্ষিত থাকার ফলে এই শহর জাঁকজমক, বিলাসিতা, শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে তখন জলপথে বাণিজ্য চলত। আর স্থলপথে চলত রাশিয়া, ইউরোপ, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে। চীনের রেশম, ভারতের নানারকম বিলাসদ্রব্য ও মসলাপাতি এবং সিংহলের (শ্রীলঙ্কা) মুক্তা ছিল প্রধান আমদানি দ্রব্য। ইথিওপিয়া ও মিশর হতে আসত হাতির দাঁতের নানা জিনিস। রাশিয়া হতে মধু, মোম, পশুর লোম, পশম আমদানি করা হত। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে চীনদেশ হতে গুটিপোকা এনে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে রেশম শিল্পের সূচনা হয়।

কনস্টান্টিনোপল কেবলমাত্র জিনিসপত্র আমদানিই করত না, বহু জিনিস এখান হতে রপ্তানি করা হত। কনস্টান্টিনোপালের অধিবাসীরা সূচীশিল্প, কারুশিল্প, কাচশিল্প এবং মিনে করায় যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। কাঁচের ওপর নানা রঙের সংযোগে তারা অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করত। এইরকম কাঁচ বা পাথর মোজেইক নামে শিল্প-জগতে পরিচিত। ইটালী, ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এইসব জিনিসপত্র রপ্তানি

করা হত। কনস্টাণ্টিনোপলের শিল্পীরা কাঠের ও হাতির দাঁতের ওপর অপূর্ব সূক্ষ্ম কাজ করত, নানারকমের জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করত। বিদেশী বাজারে এসব সৌখিন জিনিসের খুব চাহিদা ছিল।

কনস্টাণ্টিনোপলে রেশম ও রঞ্জন শিল্প ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। রাজপ্রাসাদের নিকটে ছিল এদুটি শিল্পের কারখানা। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এক বিরাট বাণিজ্যিক নৌবহর গড়ে তোলা হয়। রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপলের সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের প্রায় একশোটি বন্দরের যোগাযোগ ছিল। একে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র বলে গণ্য করা হত। কন-স্টাণ্টিনোপলের সরকারী মুদ্রার চাহিদা ছিল পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশ জুড়ে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তখন প্রচলিত ছিল। তা ছাড়া ব্যাংক ব্যবস্থারও এই সময় খুব উন্নতি ঘটে। তৎকালীন কোন দেশেই এত কম সুদে অর্থ ঋণ দেবার ব্যবস্থা ছিল না।

সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা। কনস্টাণ্টিনোপল ছিল একটি গ্রীক শহর। স্বভাবতই এখানকার সভ্যতা, ধর্মকর্ম, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা প্রভৃতি ছিল গ্রীক আদর্শে গড়া। গ্রীক সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখবার গুরুদায়িত্ব যেন কনস্টাণ্টিনোপলের ওপর বর্তেছিল। এখানে যে দর্শন আলোচনা হত তাকে খ্রীষ্টীয় দর্শন বলা হয়। তবে এ দর্শনের সঙ্গে প্রাণের যোগ ছিল গ্রীক দর্শনের। বহু গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিক পুঁথিপত্র নিয়ে এথেন্স হতে কনস্টাণ্টিনোপলে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আসেন। তাঁরা সাহিত্য ও দর্শন চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কনস্টাণ্টিনোপানের খ্রীষ্টান চার্চ গ্রীক ও রোমান গ্রন্থাবলীর নকল করা নিষিদ্ধ কাজ বলে মনে করত না। ফলে গ্রীক ও রোমান যুগের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি পড়বার সুযোগ বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত লোকেরা পেতে থাকেন।

কনস্টাণ্টিনোপল ছিল তখনকার দিনে সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র। জাস্টিনিয়ানের এক খ্রীষ্টান সভাসদ গ্রীক কবিতার সংকলন প্রকাশ করেন। জাস্টিনিয়ানের আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হলেন প্রকোপিয়াস। তিনি তিনখানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলি হতে জাস্টিনিয়ানের শাসনকালের খুঁটিনাটি ইতিহাস পাওয়া যায়।

কনস্টাণ্টিনোপল বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। এখানে ও আলেক-জান্দ্রিয়ায় মৌলিক ও মিশ্রধাতু নিয়ে গবেষণা চালানো হত। 'গ্রীক ফায়ার' নামে একরকম রাসায়নিক বস্তু তারা তৈরী করেছিল। এটিকে তরল আগুন বলা হত। শত্রু জাহাজে এটি নিক্ষেপ করলে জল দিয়েও নেবানো যেত না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা এ দুটি স্থালে ভালোভাবে হত। চিকিৎসাশাস্ত্রে কনস্টাণ্টিনোপল খুবই উন্নতি

করেছিল। জাস্টিনিয়ানের অন্যতম সভাসদ এটিয়াস ছিলেন নাক, চোখ, মুখ ও দন্ত রোগের বিশেষজ্ঞ। আলেকজাণ্ডার নামে আর একজন চিকিৎসক অন্ত্র ও ফুসফুসের রোগের ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। এই যুগেই ছাত্রদের শবব্যবচ্ছেদের সাহায্যে চিকিৎসাশাস্ত্র শেখানো হত। কনস্টাণ্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার দিনে দর্শন, আইন, সঙ্গীত, সাহিত্য, গণিত, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্রের পঠন পাঠনের সুব্যবস্থা ছিল।

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল ছিল কনস্টাণ্টিনোপল বা বাইজাণ্টিয়াম। বাইজাণ্টাইন সভ্যতার ও সংস্কৃতির যা কিছু অবদান তার অধিকাংশই বাইজাণ্টিয়ামের সৃষ্টি।

পঞ্চম অধ্যায়
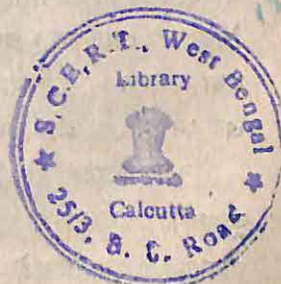
ইসলাম ধর্ম এবং তার প্রভাব

পৃথিবীর প্রধান দুটি ধর্ম ইহুদি এবং খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তির স্থল প্যালেস্টাইনের অদূরে আরবের ঊষর মরুদেশে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে একটি নতুন ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল। সে ধর্মের নাম ইসলাম, হজরত মহম্মদ নামে এক মহাপুরুষ এর প্রবর্তক।

এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে লোহিত সাগরের তীরে আরব উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপের অধিকাংশ ভাগই বালুকাময় মরুভূমি। অনন্ত বালুর রাজ্যে এখানে সেখানে কয়েকটি মরূদ্যান। এগুলিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক একটি ছোট ছোট লোকালয়। আরব দেশের প্রধান দুটি শহর মক্কা ও মদিনা সমুদ্র উপকূলেই অবস্থিত।

মহম্মদের জন্মের পূর্বে আরব দেশে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। আরবরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক উপজাতির একজন নেতা থাকত, তাকে বলা হত 'শেখ'। উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। জলের কূয়ো, মরূদ্যান, উট, ঘোড়া ও ভেড়া প্রভৃতির অধিকার নিয়ে এই যুদ্ধ হত।

আরবরা মোটামুটিভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—বালাদী এবং বেদুইন। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা একস্থানেই বসবাস করত। আর বেদুইনরা ছিল যাযাবর। ঘোড়া ও উটই ছিল এদের প্রধান বাহন। মরুদেশের কঠিন জীবনযাত্রার ফলে আরবরা ছিল সাধারণভাবে প্রচণ্ড দুঃসাহসী, যুদ্ধনিপুণ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়।

মূর্তিপূজাই ছিল আরবদের ধর্ম। প্রত্যেক উপজাতি বা গোষ্ঠীর আপন আপন দেবতা ছিল। মক্কা ছিল কিন্তু সমস্ত আরবদের প্রধান তীর্থস্থান। মক্কার প্রধান মন্দির ছিল কাবা। এখানে সাড়ে তিনশ'র বেশি দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। দেবতাদের মধ্যে 'আল্লাহ' ছিলেন প্রধান। এই মন্দিরের পরিচালনার ভার ছিল কোরায়েশ বংশের ওপর।

হজরত মহম্মদ। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা শহরে কোরায়েশ বংশের এক দরিদ্র পরিবারে মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের দু' মাস পরেই তাঁর বাবা মারা যান এবং ছ'বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। স্বভাবতই প্রচণ্ড দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে বড় হতে হয়। লেখাপড়া শেখার সুযোগ তিনি পান নি, উট ও ভেড়া চড়িয়েই তাঁর শৈশবকাল কেটেছিল। একটু বড় হলে তিনি তাঁর কাকার সঙ্গে দূর দূর দেশে বাণিজ্যের জন্য যেতেন। বুদ্ধিমান এবং কর্মঠরূপে তাঁর খ্যাতি শুনে খাদিজা নাম্নী সিরিয়ার এক ধনী মহিলা তাঁকে কর্মচারী নিযুক্ত করেন। পরে মহম্মদ খাদিজাকে বিবাহ করেন।

বিবাহ করলেন বটে, কিন্তু সংসারে তাঁর মন বসলো না। আরবদের অনৈক্য-কুসংস্কার ও কদাচার তাঁকে পীড়া দিত। সুযোগ পেলেই তিনি নির্জন স্থান হেরা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন এক রাতে হেরা গুহাতে তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন। এক জ্যোতির্ময় ছায়া তাঁকে দেখা

দিয়ে ঈশ্বরের বাণী শোনালেন—"বল মহম্মদ, আল্লাহ এক, আল্লাহ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নেই, মহম্মদ আল্লাহ-প্রেরিত পুরুষ।" মহম্মদ এই মত প্রচার করবেন ঠিক করলেন।
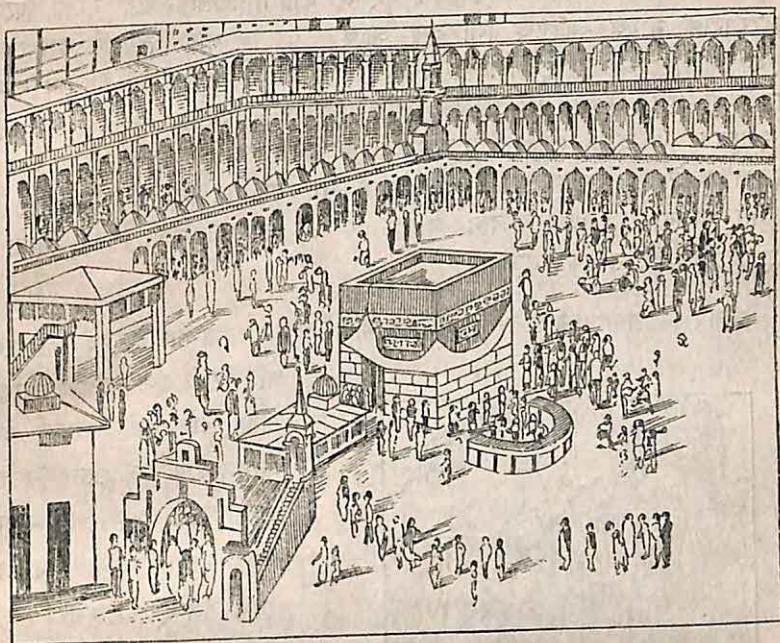
মক্কার কাবা শরীফ

এইভাবে যে নতুন ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল তারই নাম 'ইসলাম'। 'ইসলাম' কথাটির অর্থ হল, ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা। এই ধর্মের লোকেদের বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান।

ধর্মপ্রচার। প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নেমে মহম্মদকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, বহুবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়। কাবা শরিফের পুরোহিত কোরায়েশদের স্বার্থে আঘাত লাগে বলে তারা মহম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের ওপরে প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। বাধ্য হয়ে মহম্মদ তাঁর প্রিয় শিষ্যদের নিয়ে গোপনে মদিনাতে চলে গেলেন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই শুক্রবার তিনি মদিনায় গিয়ে পেঁছান। মক্কা হতে মদিনায় এই যাত্রাকে বলা হয় হিজরত বা হিজরা। এই হিজরা থেকেই মুসলমানী বছর হিসেব করা হয়।

মদিনাতে তিনি স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার শুরু করলেন। মদিনাবাসীরা তাঁর ধর্ম সানন্দে গ্রহণ করল এবং তাঁকে তাদের নেতা বলে মেনে নিল। এদিকে ক্রুদ্ধ মক্কাবাসীরা মদিনা আক্রমণ করলে বহুদিন ধরে মক্কাবাসীদের সঙ্গে মহম্মদকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। শেষে বদরের যুদ্ধে হেরে গিয়ে মক্কাবাসীরা মহম্মদের নিকট আত্মসমর্পণ

করল। এর পর ইসলাম ধর্ম মক্কায় এবং তারপর সেখান থেকে সমস্ত আরব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মক্কা জয়ের তিন বছর পরে মহম্মদ দেহত্যাগ করেন (৬৩২ খ্রীঃ)।

মহম্মদের বাণী। যে সমস্ত উপদেশ মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের সময়ে সময়ে দিতেন তা 'কোরাণ' নামক ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে মহম্মদ পেয়েছিলেন বলে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন। মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের সার কথা হল, ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বা রসুল। এ ছাড়া প্রত্যেক মুসলমানের কয়েকটি অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য আছে। তা হল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রত্যহ পাঁচবার প্রার্থনা করা, দান করা, উপবাস বিধি বা রমজান পালন করা এবং জীবনে অন্তত একবার মক্কায় তীর্থযাত্রা করা। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের একটি মূলমন্ত্র।

ইসলাম ধর্ম প্রসারেরর কারণ। নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই আরবদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা এর পর ইসলাম ধর্ম অন্যান্য দেশেও প্রচার করতে শুরু করে। মহম্মদের মৃত্যুর একশ' বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের সিন্ধু প্রদেশ থেকে ইউরোপের স্পেন দেশ পর্যন্ত এক বিশাল আরব সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ইসলামের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। সে কারণে এই ধর্মের দ্রুত প্রসারের কারণগুলি জানা দরকার।

মুর, সারাসেন, আরব প্রভৃতি জাতির লোক নিয়ে গঠিত মুসলিম বাহিনী

ইসলামের অনুশাসন আরব সমাজের অনেক দুর্নীতি দূর করেছিল। ফলে আরবরা এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। যে শক্তি তারা এতদিন নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিতে ব্যয় করেছে তা এখন এক ধর্ম প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় ফল হল বিস্ময়কর। একের পর এক রাজ্যে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ল।

ইসলামের প্রসার
৭৫০ খ্রীঃ
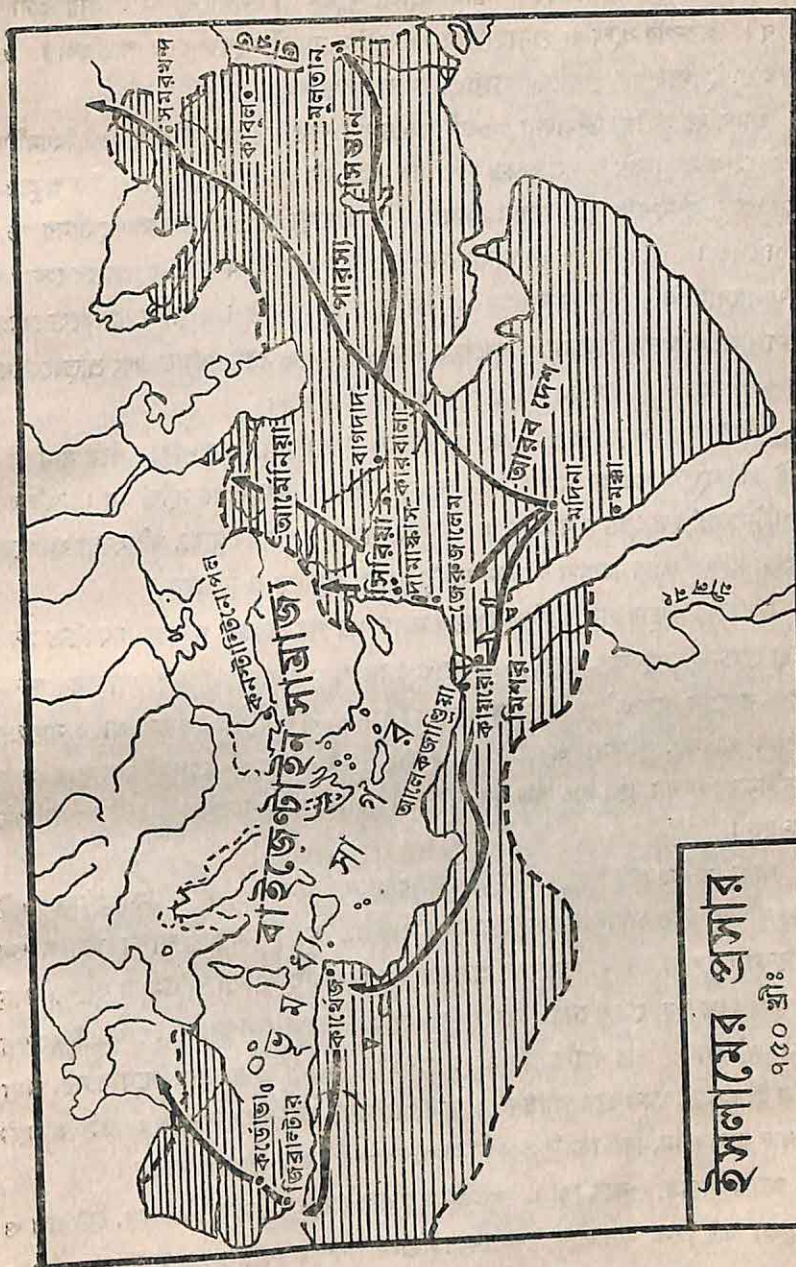
পারস্য এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দুটির দুর্বলতা ইসলামের সাফল্যের অন্যতম কারণ। পরস্পর যুদ্ধ ও হানাহানিতে এ দুটি সাম্রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বলতা ইসলাম ধর্ম প্রসারের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়।

আরবদের ধর্মীয় উন্মাদনা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হয়। বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটে এই ধারণা আরব সৈনিকদের অকুতোভয়ে শত্রুর সম্মুখীন হতে সাহস যোগাত। তা ছাড়া, যুদ্ধে জিতলে লুন্ঠনের ভাগ তারা পেত। এতে আরব যোদ্ধারা আরও দুর্দান্ত হয়ে যুদ্ধ করত। আরব সেনাদের শৃঙ্খলাবোধ ও কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল প্রশংসনীয়। আরবদের মধ্যে যোগ্য সেনাপতিরও অভাব ছিল না। সবশেষে, ইসলামের সহজ সরল ধর্মমত এবং ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শও বহুজনকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

খলিফাদের শাসনকাল। মহম্মদ কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান নি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর আরবদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য খলিফা পদের সৃষ্টি হয়। 'খলিফা' কথাটির অর্থ হল 'উত্তরাধিকারী'। মহম্মদ যেহেতু শেষ ধর্মগুরু, খলিফারা ধর্মগুরু ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের রক্ষক, প্রচারক ও বিচারক।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তিরিশ বছরের মধ্যে পর পর চারজন খলিফা নির্বাচিত হন। এঁরা হলেন আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী। এঁরা সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন বলে এঁদের বলা হয় সাধু খলিফা। এঁদের শাসনকালে আরব সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর, পারস্য এবং মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মহম্মদের মৃত্যুর সময় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ-ছয় হাজার। সাধু খলিফাদের সময় সেই সংখ্যা পাঁচ লক্ষ হয়।

সাধু খলিফাদের পর উমায়া বংশীয় বারজন সন্তান পর পর খলিফা হ'ন। এই সময় মদিনা হতে দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এঁদের শাসনকালে পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উমায়া বংশের কাছ থেকে খলিফা পদ কেড়ে নেয় আব্বাসীয় বংশ। হারুন-অল-রশীদ হলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা। তাঁর খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। ন্যায়বিচার এবং সুশাসনের জন্য তিনি ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছেন। তাঁর রাজধানী ছিল বাগদাদ শহর। তাঁর আমলে বাগদাদ ছিল জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল।

আরব সাম্রাজ্য—কর্ডোভা। খলিফাদের শাসনকালে আরবরা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে। ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চল, বেলুচিস্তান, তুর্কীস্থান, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন প্রভৃতি দেশগুলি নিয়ে

গড়ে উঠেছিল আরব সাম্রাজ্য। এই বিরাট সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন খলিফা।

কিন্তু তখনকার দিনে মদিনা, দামাস্কাস বা বাগদাদকে কেন্দ্র করে এই বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই বিভিন্ন অঞ্চলের আরব শাসনকর্তারা নিজ নিজ অঞ্চলে প্রধান হয়ে ওঠেন। সর্বপ্রথম স্পেনে এটি দেখা যায়। স্পেনের শাসনকর্তা বাগদাদের খলিফার নেতৃত্ব আগ্রহ্য করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে স্পেনে এক বিরাট অভিনব সভ্যতার পত্তন ঘটে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমদিকে আরবরা স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয়। স্পেনের আরবদের বলা হয় মুর। কর্ডোভা ছিল তাদের রাজধানী। এখানে পাঁচ লক্ষ লোকের বাস ছিল। অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ, দোকান, বাজার ইত্যাদি কর্ডোভার শোভাবর্ধন করত। পৃথিবীর সমস্ত দেশ তখন কর্ডোভার সঙ্গে পণ্যের আদান প্রদান করত। শ্বেতপাথরে তৈরি চারশ কক্ষযুক্ত সুলতানের প্রাসাদটি ছিল একেবারে নদীর ধারে। অনেক সোনার মূর্তি দিয়ে প্রাসাদটি সাজান হয়েছিল। আলহামব্রা প্রাসাদ স্পেনের আরব স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
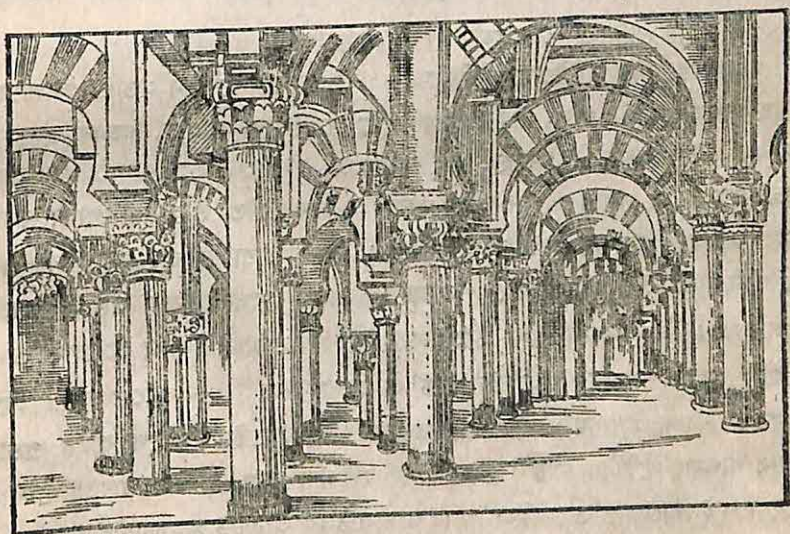
কর্ডোভার মসজিদের অভ্যন্তরভাগ

মুর শাসনকালে স্পেনের লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতে উন্নতি করেছিল। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল সারা ইউরোপে। স্পেনের বাইরে থেকেও বহু

ছাত্র এখানে আসত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্যে। কর্ডোভার রাজকীয় গ্রন্থাগারে চার লক্ষেরও বেশি বই ছিল।
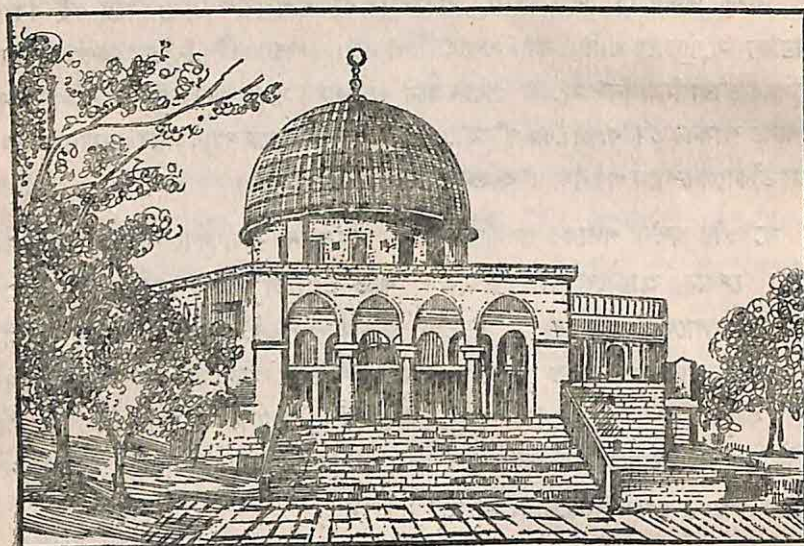
ডোম অব রক, জেরুসালেম

ইসলামের সাফল্যে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া। ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতা ইসলামের কাছে অশেষ ঋণী। খাদ্য, পানীয় থেকে শুরু করে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই তারা আরবদের কাছ থেকে গ্রহণ করে নিজেদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও তারা আরবদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করত এবং আরবদের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। কারণ তারা দেখেছে একের পর এক খ্রীষ্টান রাষ্ট্র আরবরা দখল করে নিয়েছে। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরবদের হাতে চলে গেছে। 'অবিশ্বাসী' বলে চিহ্নিত করে আরবরা তাদের অপমান করেছে যা তারা কখনো ভুলতে পারেনি। খ্রীষ্টান চার্চ বা যাজক সংঘ ইসলাম ধর্মকে ঘৃণার চোখে দেখত। কারণ ইসলাম ধর্মে পুরোহিততন্ত্রের উল্লেখ নেই। এরূপ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় খ্রীষ্টান চার্চের সমূহ বিপদ বলে গণ্য করা হয়। স্বভাবতই খ্রীষ্টান ইউরোপে ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাব গড়ে ওঠে। আর এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ক্রুসেডের রণক্ষেত্রে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবদের অবদান। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আরবরা মধ্যযুগে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। অবজ্ঞাত গ্রীক বিজ্ঞান এবং দর্শন আরবদের মাধ্যমে নবজন্ম লাভ করে। গণিত, চিকিৎসা বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে তারা

অসাধারণ উন্নতি করেছিল। বীজগণিত ও শূন্য (০) দিয়ে সংখ্যা লেখার ভারতীয় পদ্ধতি আরবদের মাধ্যমেই ইউরোপে পেঁছায়। চীনদেশ থেকে তারা কাগজ তৈরী করতে শেখে। সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, ললিতকলা ও স্থাপত্যে তাদের মৌলিক অবদান রয়েছে। মসজিদ নির্মাণে তারা অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছে। জেরুসালেমের ডোম অব রক বা পাহাড়ী গম্বুজ স্থাপত্য শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কর্ডোভার মসজিদ, আলহামব্রার সিংহ প্রাসাদ স্পেনে আরব স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আরবরা এক নতুন শিল্পধারারও প্রবর্তক। আরবীয় শিল্পীরা চারুশিল্পে পাতা, ফুল, রেখা, নানারকম জ্যামিতিক গঠন প্রভৃতি নানা ভঙ্গিতে সন্নিবিষ্ট করে এক অপূর্ব শিল্পরীতির সৃষ্টি করে। একে অ্যারাবেস্কে (আরবীয়) শিল্প বলা হয়। শিক্ষার ব্যাপারেও আরবরা পিছিয়ে ছিল না। বাগদাদ, কর্ডোভা এবং কায়রোর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান।

পাণ্ডিত্যের জন্য কয়েকজন আরব পণ্ডিত সে যুগে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁরা বিশেষ করে চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আরব পণ্ডিতেরা নিজেদের কোন একটি বিষয়ের চর্চায় নিজেদের নিযুক্ত রাখেন নি। দর্শনের সঙ্গে রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, প্রাণিবিদ্যা, তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল।

আরব পণ্ডিতদের মধ্যে হুনাইন ছিলেন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। প্রধানতঃ রসায়নবিদ্ হলেও তিনি ছিলেন 'অনুবাদের সম্রাট'। গ্রীক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থসমূহের তিনি আরবী অনুবাদ করেন। আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে অল্‌তবারী, ইবন খালদুন, অল-বিরুনীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অল্‌তবারী চল্লিশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর 'কিতাব' রচনা করেন। এই গ্রন্থে প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে দশম শতক পর্যন্ত যুগের একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। ইবন খালদুন তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশে সে দেশের ইতিহাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অলবিরুণী কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত। দর্শন, ভূবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কাব্যে তাঁর দান ছিল অসামান্য। তিনি সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে আসেন এবং "তারিখ-অল-হিন্দ" নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি ভারতের ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান। এ ছাড়া অল-হাইলাম ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, জুবের ছিলেন রসায়নবিদ্ অল-রজি ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। সাহিত্যে ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসী ও শেখ সাদীর নাম প্রসিদ্ধ। মুসলমান জগতের আর দুজন মহাপণ্ডিতের নাম উল্লেখ করতে হয়। এরা হলেন ইবনসিনা ও

ইবন রসীদ। ইউরোপে ইবনসিনা অভিসেন্না এবং ইবন রসীদ আভেরোজ নামে পরিচিত। ইবনসিনা ছিলেন চিকিৎসক ও দার্শনিক। এ ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সতেরো শতক পর্যন্ত ইউরোপের চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর মত প্রামাণিক হিসাবে গণ্য করা হত। ইবন রসীদও ধর্ম, বিজ্ঞান, ব্যবহারতত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং গণিতে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং এগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল। প্যারিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তাঁর রচনা স্থান পেয়েছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

শার্লেমান ও পবিত্র রোম সাম্রাজ্য

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য খুব দুর্বল হয়ে পড়লে যে সব জার্মান উপজাতি ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ দখল করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ফ্রাংকরা ছিল তাদের অন্যতম। ফ্রাংকদের রাজ্য ছিল রাইন অঞ্চলে, বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছু অংশ নিয়ে।

শার্লেমানের পিতামহ চার্লস মার্টেল ছিলেন ফ্রাংক রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। স্পেনের মুসলমান সুলতান যখন পশ্চিম ইউরোপ দখল করবার জন্য আক্রমণ করেন তখন মার্টেলের নেতৃত্বেই ফ্রাংকরা টুরের যুদ্ধে (৭৩২ খৃীঃ) সুলতানকে পরাজিত করে পশ্চিম ইউরোপকে রক্ষা করেছিল। চার্লস মার্টেলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পেপিন রাজবংশের উচ্ছেদ করে নিজেই ফ্রাংকদের রাজা হন। ৭৬৮ খৃীষ্টাব্দে পেপিনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র কার্লম্যান এবং শার্লেমান ফ্রাংক রাজ্য ভাগ করে নিয়ে নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করতে থাকেন।

শার্লেমান

কার্লম্যান ৭৭১ খৃীষ্টাব্দে মারা যান। ফলে শার্লেমানই ফ্রাংক রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হলেন।

শার্লেমান ছিলেন বীর যোদ্ধা। তেতাল্লিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বে তিনি অন্ততঃ চুয়ান্নবার নিজেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলেন। দক্ষিণে ইটালীর লম্বার্ডি, উত্তরে জার্মানীর স্যাক্সনী, পূর্বে শ্লাভ, পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত তাঁর রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হয়। এই বিরাট অঞ্চলে তিনি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

শার্লেমানের
সাম্রাজ্য
৮১৪ খ্রীঃ
আয়ারল্যাণ্ড
ওয়েলস
অ্যাংলো-স্যাক্সন
স্লাভ
স্যাক্সোনি
ব্রেটন
প্যারিস
আলেমানিয়া
বাভেরিয়া
আ ভা র
করিন্থিয়া
ক্রোটস
লোম্বার্ড
রাজ্য
গ্যাসকনি
রোম
ওমিয়াদ
আমীরশাহী
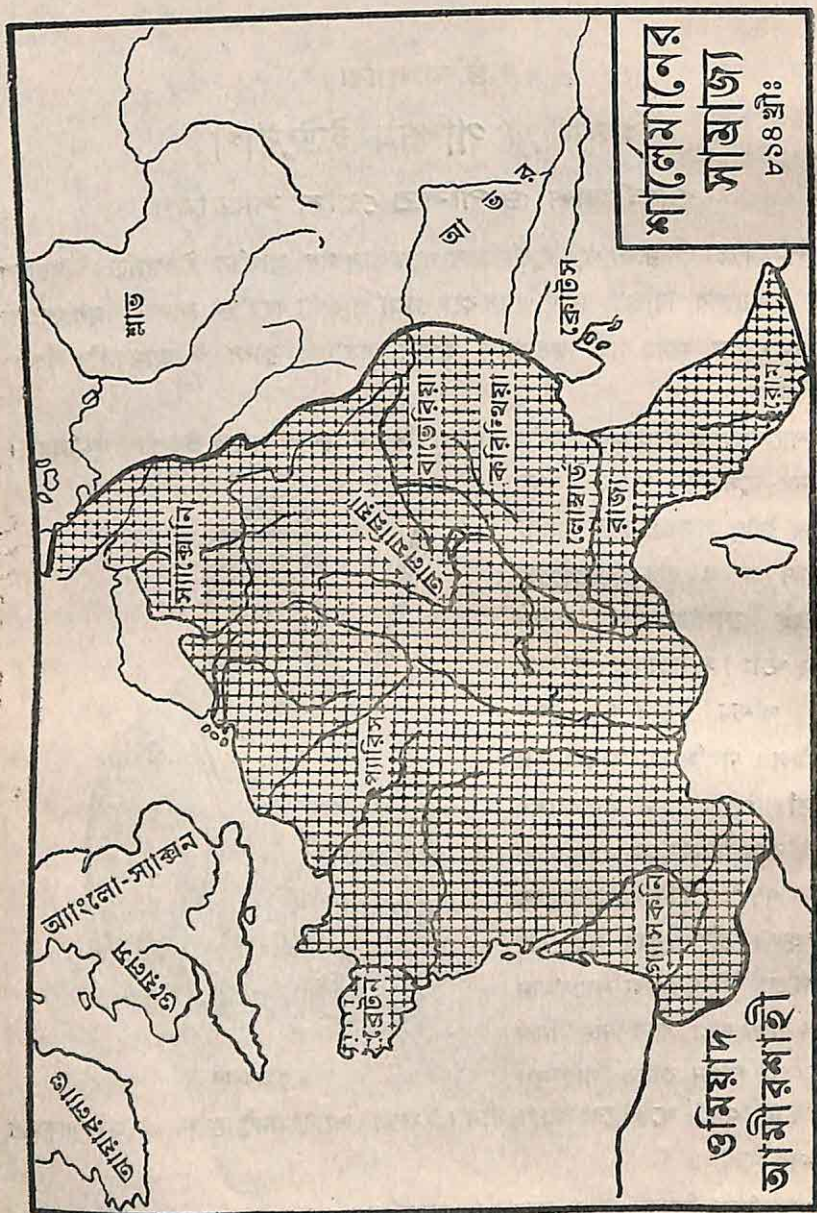
শার্লেমানের অভিষেক। খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ তৃতীয় লিও ৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে একবার তাঁর শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রোম হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তিনি শার্লেমানের শিবিরে গিয়ে তাঁর সাহায্যে প্রার্থনা করেন। শার্লেমান সসৈন্যে রোমে যান এবং পোপের শত্রুদের দমন করেন। পোপ তাঁর ক্ষমতা ফিরে পেলেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিন শার্লেমান রোমেই কাটালেন। যীশুর জন্মদিনের দিন সদলে তিনি সেণ্ট পিটারের গীর্জায় উপাসনা করতে যান। বেদীর সামনে উপাসনা শেষ করে সবে উঠতে যাবেন এমন সময় পোপ এগিয়ে এসে তাঁর মাথায় রোম সম্রাটের সোনার মুকুট পরিয়ে দিলেন। এই নাটকীয় দৃশ্যে অভিভূত হয়ে সমবেত জনতা তাঁকে রোমের সম্রাট এবং ধর্মরক্ষক বলে অভিনন্দন জানায়। এইভাবে শার্লেমান পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হলেন। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছিল। রোমের সম্রাট হিসেবে শার্লেমানের অভিষেক হওয়ায় জনসাধারণের ধারণা হল যে, আবার প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর পর প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের বুঝি পুনরুত্থান ঘটল।

পোপ শার্লেমানের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন

শার্লেমানের অভিষেককে অনেকে মধ্যযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করেন। এই অভিষেক জার্মান জাতির ও শার্লেমানের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করে। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের মর্যাদা এতে কমে যায় এবং চিরদিনের জন্য রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশ পশ্চিম অংশ হাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই সময় হতে 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে'র ধারণার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে রোমান ও জার্মান সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এক বলিষ্ঠ সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। এ ব্যাপারে অভিষেক ঘটনাটির যথেষ্ট অবদান আছে।

মধ্যযুগে রাষ্ট্রশক্তি এবং চার্চের মধ্যে অধিকারগত প্রশ্ন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাকে এই ঐতিহাসিক অভিষেকের ঘটনা জটিলতর করে তোলে। এর পর পোপেরা দাবী করলেন তাঁরা সম্রাটদের ওপরে। কারণ পোপ শার্লেমানকে মুকুট পরিয়ে দেন,

আর সম্রাটরা দাবী করলেন তাঁরা পোপের ওপরে। কারণ পোপকে ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন শার্লেমান।

শার্লেমানের আমলে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে চার্চের সম্পর্ক। শার্লেমান একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের অভিষেকের ঘটনা তাঁর সাম্রাজ্যকে পবিত্র রূপ দান করল, আর তিনি নিজে ঈশ্বরের প্রতিভূর মর্যাদা লাভ করলেন। তিনি নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি কখনো চার্চকে রাষ্ট্রশক্তির ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেন নি। নিজেকে তিনি রাজ্য শাসন এবং ধর্মীয়—উভয় ক্ষেত্রেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। তিনি নিজে ধর্মযাজকদের নিয়োগ করতেন, তাঁদের অধিকারের সীমা নির্ধারণ করতেন। এমনকি রাজকার্যে যাজকদের তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করতেন এবং ধর্মীয় অনুশাসন প্রচার করতেন। সঙ্গে সঙ্গে চার্চের দুর্নীতি দূর করার জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এইভাবে শার্লেমানের আমলে চার্চ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

শার্লেমানের রাজসভা—শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি শার্লেমানের গভীর আগ্রহ ছিল। ইউরোপের নানা দেশ থেকে জ্ঞানী-গুণী এনে তিনি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেন। এঁদের মধ্যে আলকুইন ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। আইনহার্ড ছিলেন তাঁর কর্মসচিব এবং জীবন-চরিত লেখক। তাঁর লেখা হতে শার্লেমানের শাসন সম্বন্ধে বহু খবর জানা যায়। ইটালীর পিসা হতে পিটার নামে এক পন্ডিতকে ও স্পেন থেকে অ্যাগোবার্ড নামে এক গুণী ব্যক্তিকে সাহিত্য এবং ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য সভায় নিয়ে আসেন। এ ছাড়া স্পেন হতে কবি থিওডলফ এবং লম্বার্ডি হতে ঐতিহাসিক পল এসেছিলেন।

আলকুইন

শিক্ষা প্রসারে শার্লেমান আগ্রহী ছিলেন। তিনি যাজকদের অশিক্ষা-কুশিক্ষায় বিরক্ত হয়ে তাঁর রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারে নজর দেন। তাঁর নির্দেশে বিশপের কার্যালয়-সংলগ্ন এবং মঠ-সংলগ্ন স্কুল স্থাপিত হয়। রাজ পরিবার ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় সন্তানরা যাতে প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারে তার জন্য তিনি রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটিকে প্রসাদ-সংলগ্ন বিদ্যালয় বলা হয়। তাঁর সাম্রাজ্যে কোথাও

কোন প্রতিভাশালী ছাত্রের সন্ধান পেলে তাকে তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দিতেন। জ্ঞান প্রসারের জন্য তিনি প্রাচীন পুঁথিপত্রের অনুলিপি করাবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় ব্যাকরণ সংকলিত হয় এবং ফ্রাঙ্ক লোকগাথা সংগৃহীত হয়। তাঁরই আনুকূল্যে ডেকনের পল বাইবেলের শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন। কবি থিওডলফ তাঁর অনুপ্রেরণায় বহু বিষয়ে কবিতা রচনা করেন।

শার্লেমানের রাজধানী ছিল রাইন নদীর তীরে আখেন শহরে। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন নতুন রোম। তিনি রাজধানীতে প্রসাদ ও গীর্জাগুলি সুসজ্জিত ও অলংকৃত করেন। এর জন্য বহু শিল্পী ও স্থপতির আগমন ঘটেছিল। ফলে স্থাপত্য ও শিল্পে প্রাণসঞ্চার হয়। সর্বদিক থেকে বিবেচনা করেই ঐতিহাসিকরা শার্লেমানকে 'মহান' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

মধ্যযুগের মঠ

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। খৃষ্টধর্মের কঠোর তপশ্চর্য্যার আদর্শ থেকেই মধ্যযুগের মনাষ্টারি বা মঠগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয়-আশয়ের সংসর্গ সকল দুঃখের মূলে, এই দর্শনই মানুষকে, সন্ন্যাস জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করত। মধ্যযুগে মঠগুলির উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

মঠের সন্ন্যাসী (অ্যাবট)

ইউরোপের নানা অঞ্চলে মঠগুলি গড়ে ওঠে। প্রতিটি মঠেরই যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ছিল। বহু নিঃসন্তান ধনী নরনারী মৃত্যুর পূর্বে নিজেদের বিষয় সম্পত্তি মঠকে দান করে যেতেন। এইভাবে মঠগুলি প্রচুর সম্পত্তি এবং অর্থের অধিকারী হত। মঠের প্রধানকে বলা হত 'অ্যাবট'। তাঁর খুব সম্মান ছিল। মঠের সাধারণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীকে 'মঙ্ক' বলা হত। নারীরাও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে পারতেন। সন্ন্যাসিনীদের বলা হত 'নান'। আর তাঁদের মঠের নাম ছিল 'নানারি'। 'নানারি'র দায়িত্বে থাকতেন 'অ্যাবেস'। আর এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন অঞ্চল

ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার ও জনসাধারণের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। তাদের বলা হত 'ফ্রায়ার'।

মঠের জীবন। প্রত্যেক মঠেরই নিজস্ব কতকগুলি নিয়ম-কানুন থাকত। বিখ্যাত মণ্টে ক্যাসিনো মঠের প্রতিষ্ঠাতা বেনেডিক্ট তাঁর মঠের সন্ন্যাসীদের জন্য একটি নিয়ম-কানুন বা অবশ্যপালনীয় আচরণ-বিধি প্রণয়ন করেন। এই আচরণবিধি ইউরোপের অধিকাংশ মঠই গ্রহণ করেছিল। এটিকে 'বেনেডিক্টের শপথ' বলা হয়।

মঠের সন্ন্যাসিনী

বেনেডিক্টের পূর্বে যারা সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করতেন তাদের কোন শপথ নিতে হত না। স্বভাবতই সন্ন্যাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। বেনেডিক্টের বিধিতে সন্ন্যাসী ও

সেন্ট বেনেডিক্ট
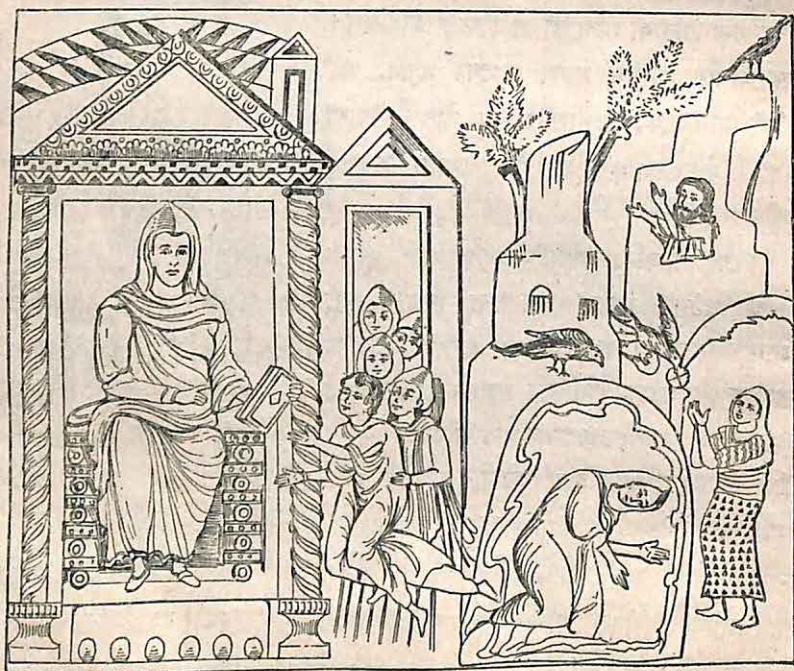
সন্ন্যাসিনীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়। বেনেডিক্ট মনে করতেন যেসব মঠবাসী সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি সুশৃংখল নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সন্ন্যাস জীবনের প্রথমে নিষ্ঠা ও কঠোরতার মধ্যে শিক্ষানবিস কাল কাটাতে হবে। এই স্তর পার হবার পর তাঁকে একটি শপথ গ্রহণ করে বলতে হ'তঃ তাঁরা দরিদ্রের মত জীবন যাপন করবেন, ব্রহ্মচর্য পালন করবেন,
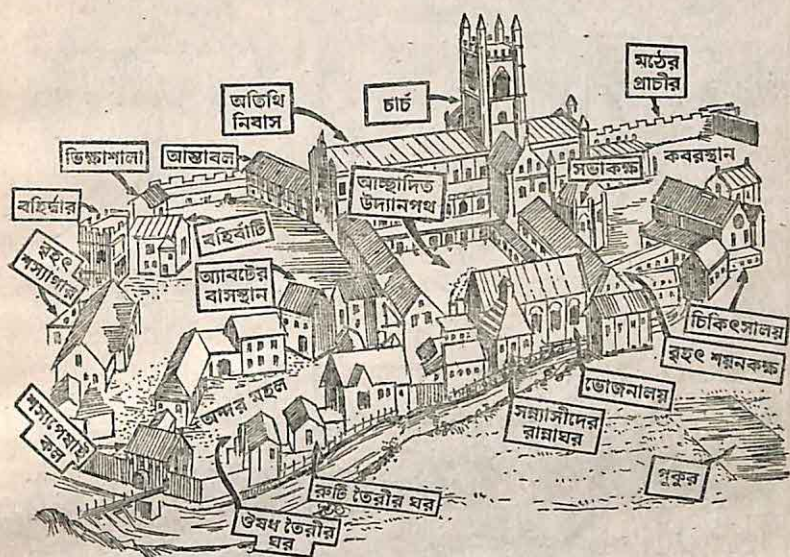
আদর্শ মঠের বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র

আমৃত্যুকাল মঠে থাকবেন এবং মঠাধ্যক্ষের সমস্ত আদেশ মেনে চলবেন। এই শপথ বাক্যটি পাঠ করার পর স্বাক্ষর করে চার্চের বেদীতে রেখে আসতে হত। এ ছাড়া মঠাধ্যক্ষের বিনা অনুমতিতে তাঁরা মঠ ত্যাগ করতে পারতেন না।

সন্ন্যাসীদের পড়াশুনা, শিক্ষকতা এবং উপাসনা করতে হত। কতকগুলি সামাজিক দায়-দায়িত্বও পালন করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য-কর্মের মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁরা আর্ত ও পীড়িতের সেবা করতেন। পথিককে আশ্রয় দিতেন, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষাদান ও পুঁথিপত্রের অনুলিপিতে ব্যস্ত থাকতেন। এজন্য প্রতিটি মঠে হাসপাতাল, অতিথিশালা ও পুঁথিপত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র থাকত।

তাঁরা মঠ-সংলগ্ন জমি নিজের হাতে চাষ আবাদ করতেন এবং জনসাধারণকে পশু-

পালন, সেচব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ আবাদের কৌশল শিক্ষা দিতেন। জনস্বাস্থ্যের দিকেও তাঁরা লক্ষ্য রাখতেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রসারেও তাঁরা সাহায্য করতেন।
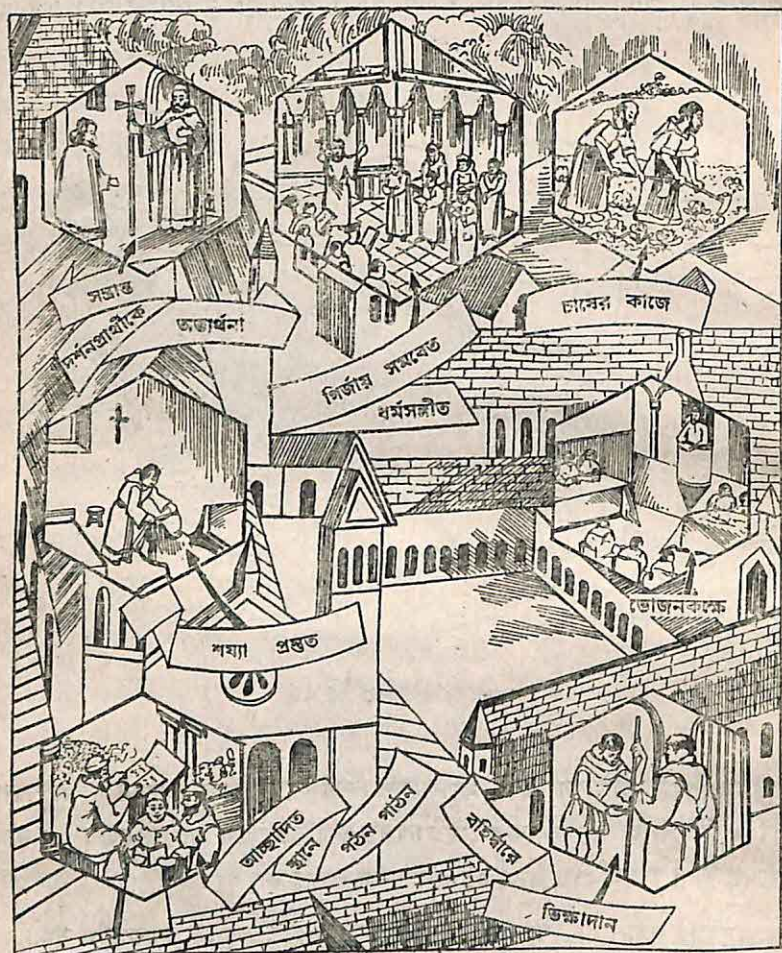
মঠের সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

মধ্যযুগের মঠগুলি ছিল শিক্ষাদীক্ষার প্রাণকেন্দ্র। অনেক প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি করে তাঁরা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের জন্যই প্রাচীন বহু অমূল্য গ্রন্থ ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে। তা ছাড়া সন্ন্যাসীদের

মধ্যে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ কালজয়ী হয়েছে।

মঠের সন্ন্যাসী পুঁথিপত্রের নকল করছেন

ক্লুনি সংস্কার। বেনেডিক্টের আচরণবিধির দ্বারা মঠগুলি যেভাবে তৈরী হয়েছিল তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা প্রথমদিকে ধর্ম ও কর্তব্যকর্মে খুব নিষ্ঠা দেখান, কিন্তু কালক্রমে তাঁরা কর্তব্যক্রমে অবহেলা করতে থাকেন এবং অলস ও বিলাসী হয়ে পড়েন। কিছু সংখ্যক মঠাধ্যক্ষ অভিজাতদের ন্যায় জীবন যাপন শুরু করেন। মঠগুলির ওপর রাজা বা সামন্তরা প্রভাব বিস্তার করেন। এগুলিকে তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করলেন। অনেক ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী নন এমন লোককে মঠের অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হল। এর বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা সংস্কার চাইলেন। আর এই সংস্কার এল ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্লুনি নামক স্থানের বেনেডিক্ট মঠ হতে।

৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই মঠটি স্থাপিত হয়। প্রথম হতেই এটি সামন্ত প্রথার প্রভাবমুক্ত ছিল। স্থানীয় চার্চও এর ওপর খবরদারি করতে পারত না। স্বভাবতই যাঁরা প্রকৃত মঠবাসী ছিলেন তাঁরা ক্লুনিকে অনুসরণ করতে চাইলেন। ফলে ক্লুনির প্রভাব বাড়তে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই ক্লুনি মঠের নেতৃত্বে মঠ-সম্বন্ধীয় একটি নিয়মবিধি প্রণীত হয়। এই বিধির দ্বারা বেনেডিক্টের সন্ন্যাসীদের অবশ্যপালনীয় আচরণবিধির কিছুটা পরিবর্তন করে প্রতিটি মঠে যাতে তা ঠিক ঠিকভাবে পালিত হয় তার ব্যবস্থা করা হয়। এতে প্রার্থনা ও সন্ন্যাসীদের চারিত্রিক বিশুদ্ধতার ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়। চার্চের যাজকদেরও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, বিশপ বা আর্চ বিশপ যাজকদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সন্ন্যাসীরাও যাজক হতে পারবেন বলে এতে

উল্লেখ করা হল। তা ছাড়া মঠের সম্পত্তি মঠই ভোগ করবে, জমিদার বা রাজার কর্তৃত্ব মানা হবে না, মঠগুলিকে সামন্ত প্রথার আওতা হতে মুক্ত রাখতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ক্লুনির সংস্কার কেবলমাত্র মঠ-সংস্কারেই সীমাবদ্ধ রইল না।
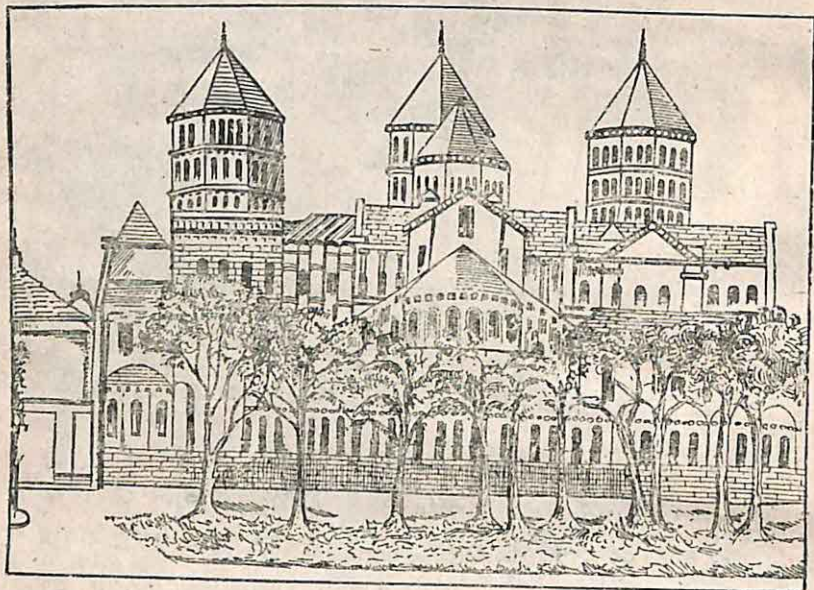
ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্লুনির মঠ

মঠের সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিশপ নিযুক্ত হয়ে চার্চে ক্লুনি সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হলেন। যাজক শ্রেণীকেও বেনেডিক্টের নিয়মকানুন মানতে বাধ্য করা হল। চার্চের ভূসম্পত্তি চার্চই ভোগ করবে। কোন সংসারী লোক, জমিদার বা রাজা এর ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না বলে ঘোষণা করা হল।

ক্লুনি মঠের অধীনে প্রায় তিন শ' মঠ ছিল। ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড, জার্মানী, লোরেন ও ইটালীর মঠগুলি ক্লুনি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্লুনি মঠের অধ্যক্ষই ছিলেন প্রধান অধ্যক্ষ। অন্যান্য মঠের অধ্যক্ষদের তিনিই নিয়োগ করতেন। তাদের বলা হত প্রিয়র। এঁরা ক্লুনি মঠের মঠাধ্যক্ষের কথামতো কাজ করতেন।

ইনভেস্টিচার কনটেস্ট বা চার্চ বনাম রাজশক্তির সংগ্রাম। ক্লুনি সংস্কারের দ্বারা চার্চের শাসন কাঠামোতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। রাজা এবং সামন্তরা এই পরিবর্তনে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। উভয় পক্ষই একে অপরের চেয়ে বড় বলে মনে করত। ফলে সংঘর্ষ দেখা দিল। ইতিহাসে এক বলে 'ইনভেস্টিচার কনটেস্ট'।

বহুদিন ধরে রাজা বা বড় সামন্তরা বিশপ নিযুক্ত করে আসছিলেন। ক্লুনি সংস্কার দ্বারা ঠিক হল যে কে বিশপ হবেন যাজকরাই তা ঠিক করবেন। অবশ্য যাজকদের দ্বারা নির্বাচিত বিশপকে পোপের সমর্থন পেতে হবে। এর দ্বারা চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাতে ছেদ পড়বার উপক্রম হল।

রাজা ও জমিদারদের আর্থিক অবস্থা অনেকটা নির্ভর করত চার্চের সম্পত্তির ওপর। এখন চার্চ যদি তাদের প্রভাব হতে মুক্ত হয় তা হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জার্মানীতে বিশেষ করে এই সমস্যা দেখা দেয়। কারণ সেখানকার অধিকাংশ ভালো জমির মালিক ছিল চার্চ। ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করল তার মোকাবিলা করবার জন্য স্বয়ং পোপ এগিয়ে এলেন। তিনিই তখন হতে এই আন্দোলনটি পরিচালনা করতে লাগলেন।

পবিত্র রোমান সম্রাটদের সঙ্গে পোপদের বিরোধ দেখা দিল। কে বড় কে ছোট এই নিয়ে সংঘর্ষ বাধল। পোপ প্রমাণ করতে চাইলেন রাষ্ট্রের ওপরে চার্চ। সম্রাটরা ঠিক এর বিপরীত কথা বললেন। এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। কখনো পোপ কখনো সম্রাট জয়ী হন। জাতীয় চার্চ ও জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি। মধ্যযুগে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার

ক্যাথিড্রাল স্কুলে পঠন-পাঠন

বিশেষ চাহিদা ছিল না এমন কি রাজা হতে শুরু করে প্রায় সকলেই ছিল নিরক্ষর। কেবলমাত্র যাজক শ্রেণীই কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। সন্ন্যাসী ও যাজকদের লেখাপড়া

শেখাবার জন্য প্রধানতঃ দু' প্রকারের স্কুল ছিল। ক্যাথিড্রালে যে সব স্কুল বসত সেগুলিকে ক্যাথিড্রাল স্কুল বলা হত। এই স্কুলগুলি ছিল বিশপের নিয়ন্ত্রণে। যে সব বালক যাজকবৃত্তি গ্রহণ করবে বলে মনে হত তাদেরই এ সব স্কুলে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। আর প্রতিটি মঠে যে স্কুল ছিল তাকে বলা হত মনাস্টিক স্কুল। এসব স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হত তা পুরোপুরি ছিল ধর্মীয় শিক্ষা।

মানষ্টিক স্কুলে পঠন-পাঠন

ক্যাথিড্রাল স্কুলগুলি সাধারণতঃ শহরাঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে কয়েকটি ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন স্কুল দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। চার্চের মর্যাদা আর সুযোগ অনুযায়ী এই স্কুলগুলি

মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন।
ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনারত আলবার্ট ম্যাগনাস।

পরিচালিত হত। শিক্ষকরাও ছিলেন সব নামকরা। এখানে মাঝে মাঝে ধর্ম সম্পর্কে নানারকম আলোচনা-চক্র বসত। যে সব ক্যাথিড্রাল স্কুলে ঘন ঘন আলোচনা-চক্র আহূত হত সেখানে ক্রমে শিক্ষক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। খ্যাতনামা শিক্ষক বা পণ্ডিতদের আকর্ষণে বিভিন্ন দেশ হতে ছাত্র সমাগম হতে লাগল। শিক্ষক এবং ছাত্রদের এই যৌথ উপনিবেশই হ'ল মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র পড়াশুনার জন্য শহরে বসবাস শুরু করে। তাদের সঙ্গে শহর কর্তৃপক্ষের অধ্যাপক নিয়োগ এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তা ছাড়া কোন্ অঞ্চলে নামকরা শিক্ষক পাওয়া যাবে সে নিয়েও মতবিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে পুর কর্তৃপক্ষ কয়েকটি স্থানকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে স্বীকার করে নেন। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে ক্ষমতা ও বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। পোপ, পবিত্র রোম সম্রাট বা দেশের রাজা সনদের মাধ্যমে এই ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ছিল ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ডিগ্রি দেওয়া। এই ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্রের ছিল না।

টমাস একুইনাস

এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের বলা হত স্কুলম্যান বা স্কলাস্টিকস্। তাদের ঝোক ছিল যুক্তিবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রের ওপর। এই যুক্তিবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রের ভিত্তি ছিল বাইবেল। এরা সকলেই ছিলেন সন্ন্যাসী বা যাজক। পিটার আবেলার্ড এই যুগের একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসী পণ্ডিত। তিনি সারাজীবন অধ্যাপনায় কাটান। ধর্মশাস্ত্রের (বাইবেলের) পরই তিনি তর্কশাস্ত্রকে স্থান দেন। তিনি প্যারিসের ক্যাথিড্রাল স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে তাঁকে ঘিরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। আলবার্ট ম্যাগনাস ছিলেন আর একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি ধর্মবিষয় ছাড়াও প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেন টমাস একুইনাস। সমস্ত ক্যাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর দর্শনকে আজও একমাত্র সঠিক দর্শন বলে শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। এ যুগে আরও কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও দার্শনিক আবির্ভূত

হয়েছিলেন। রজার বেকন, ডান স্কোটাস ও ওকাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রজার বেকন ছিলেন মহাপণ্ডিত। গণিত, রসায়ন এবং ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান তখনকার দিনে বিস্ময় সঞ্চার করত।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। দ্বাদশ শতকে ইউরোপের মানুষের মনে নতুন চেতনা জাগে। শিক্ষালাভ করবার জন্য তাদের আগ্রহ দেখা দেয়। দূর-দূরান্তর হতে কি বৃদ্ধ কি যুবক বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করবার জন্য যেত। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অনেকটা শহরের প্রভু-শিল্পী ও শিক্ষার্থী-শিল্পীর সম্পর্কের ন্যায়। প্রত্যেকেই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতেন। সকাল ছ'টা থেকে দশটা পর্যন্ত ছাত্ররা অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনত। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করত। অধ্যাপকরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তা ছিলেন এবং তাঁরা ছাত্রদের ডিগ্রি দিতেন। সেকালে হাতে লেখা পুঁথি বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারও তেমন বড় ছিল না, পুস্তকের সংখ্যা ছিল অল্প। সুতরাং ছাত্ররা অধ্যাপকদের বাক্‌ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের ঘিরে থাকত। তাঁদের বক্তৃতা ছাত্ররা মোমের পাতের ওপর লিখে নিত। এর ওপর নির্ভর করে তাদের পরীক্ষা দিতে হত।

বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধার সূচনা। দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজে নব চেতনার সঞ্চার হয়। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলে গ্রীক ও ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ইউরোপবাসীদের পরিচয় ঘটে। একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় আর তাদের জ্ঞানের পিপাসা মিটল না। আইন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য ও অন্যান্য মননবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। ফলে এসব বিষয়ের পঠন-পাঠনের জন্য উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে।

দ্বাদশ শতকে ইটালীর সালার্নোতে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বোলোনাতে আইনশাস্ত্র পড়াবার ব্যবস্থা হয়। এর কারণ হল সিসিলিতে মুসলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এ দুটির স্থান ছিল এবং ইটালীর বিভিন্ন নগরে বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে চিকিৎসক ও আইন-জীবীর চাহিদা ছিল। ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ছিল সর্বোত্তম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য সর্বপ্রথম চারটি বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা হয়—চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং কলাবিদ্যা। কলাবিদ্যা বলতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র বোঝাত। ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল বিপুল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ত প্রথা

অশোকের সাম্রাজ্য বা রোম সাম্রাজ্য সম্বন্ধে ধারণা আমরা সহজেই করতে পারি। বর্তমানে রাষ্ট্র বলতে আমরা যা বুঝি তার সাথে এগুলির সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ত রাজ্য সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। কারণ সামন্ত ব্যবস্থা সহজ ও সরল ছিল না। এক একটি অঞ্চলে এক এক প্রকারের সামন্ত রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তবে ফ্রান্সে যে সামন্ত প্রথা গড়ে ওঠে সেটাই আদর্শ সামন্ত প্রথা বলে গণ্য করা হয়।

সামন্ত প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ। সামন্ত প্রথার সূত্রপাত হয় প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর। জার্মান উপজাতিরা যেসব রাজ্য গড়ে তোলে সেখানে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। তারা সে যুগের উৎপাদনের প্রধান উপায় অর্থাৎ জমির মালিক ছিল। তারা নিজেরা জমি চাষ করত না। যারা চাষ করত তাদের শোষণ করবার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ফলে দেখা দেয় সামন্ত প্রথা।

শার্লেমানের সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সময় সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা বলে কিছু ছিল না। এক জায়গার লোকের সঙ্গে আর এক জায়গার লোকের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সাধারণ মানুষ শক্তিশালী লোকেদের শাসন মেনে নিল। তাদের প্রভু বলে স্বীকার করল। এই শক্তিশালী লোকেরাই ছিল জমির মালিক। ফলে তারা ইচ্ছামত আপন আপন এলাকায় শাসন করতে লাগল এবং সামন্ত নামে তারা পরিচিত হল। তারাই এই সমাজে প্রধান শক্তি ছিল বলে এই সমাজকে বলা হয় সামন্ত সমাজ।

সামন্ত প্রথার বৈশিষ্ট্য। সামন্ত প্রথার মূল নীতি এই যে রাজা সমস্ত জমির মালিক। তিনি তাঁর প্রধান কর্মচারী ও অনুগত ব্যক্তিদের জমিদারী দিতেন। এই জমিদার রাজাকে কোনরূপ খাজনা দিতেন না। প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সৈন্য নিয়ে রাজার পক্ষে যুদ্ধ করতেন। যাঁরা সরাসরি যুদ্ধ করবার শর্তে রাজার নিকট হতে জমিদারী পেতেন তাদের বলা হত বড় জমিদার। এঁরা ডিউক, আর্ল, কাউন্ট ইত্যাদি নামে অভিহিত ছিলেন। সাধারণভাবে এঁদের লর্ড বলা হত।

লর্ডরাও রাজার মত তাঁদের অনুচরদের মধ্যে জমি বিলি করতেন। এঁদের মাঝারি জমিদার বলা হত। এঁরা ব্যারণ নামে অভিহিত হতেন। আবার দরকার মনে করলে এঁরা নিম্নতর জমিদারদের জমি দিতেন। এদের বলা হত ছোট জমিদার। এঁরা নাইট

নামে অভিহিত ছিলেন। বড় ও মাঝারি জমিদারদেরই সাধারণভাবে লর্ড বলা হত। তবে এঁরা সকলেই রাজাকে তাঁদের প্রভু বলে মেনে নিতেন এবং তাঁর প্রতি দায়-দায়িত্ব পালন করতেন। জমির মালিক নিজে চাষ করতেন না। তাদের জমিতে যারা চাষ

করত তারা সার্ফ বা ভিলেন নামে পরিচিত ছিল। জমিদাররা এদের বিপদ হতে রক্ষা করতেন। লর্ডরা নিজের নিজের এলাকায় শান্তি রক্ষা করতেন। দেশের প্রচলিত প্রথা বা আইন অনুসারে প্রজাদের মামলা-মোকদ্দমার বিচার করতেন। প্রত্যেক লর্ডই ছিলেন নিজের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই প্রথায় রাজার সহিত ছোট জমিদার বা প্রজাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা নিজ নিজ লর্ডের হুকুম মানতে বাধ্য ছিল। সুতরাং কোন লর্ড রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তার অধীনস্থ ছোট জমিদার ও সাধারণ প্রজাও তার দলে যোগ দিতে বাধ্য হত। সুতরাং রাজা দেশের অধীশ্বর হলেও সামন্ত যুগে রাজাদের শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রশক্তি জমিদারদের হাতের মুঠোয় ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট ছিল না। এই সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল আঞ্চলিক প্রথা ও সংস্কারের মাধ্যমে। একাদশ শতকে অবশ্য সামন্ত প্রথার একটা কাঠামো পাওয়া যায়। এটা হল ব্যক্তিগত সাহায্য বা সেবার পরিবর্তে জমি বা সম্পত্তি ভোগ। রাজা বা বড় জমিদার যিনি জমি বিতরণ করতেন তাঁকে বলা হত লর্ড এবং যে জমি গ্রহণ করতেন তাঁকে ভ্যাসাল বা অধস্তন বলা হত। একখণ্ড জমি যা লর্ড অধস্তনকে দিতেন তাকে ইংরেজীতে ফিফ বলা হত। এই 'ফিফ' কথাটি হতে 'ফিউডালিজম' কথাটি এসেছে। এই ভূমিদান ও গ্রহণ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হত।

সাধারণতঃ এই অনুষ্ঠানে ভ্যাসাল নতজানু হয়ে লর্ডের হাতে হাত রাখত এবং নিজেকে লর্ডের অধস্তন ব্যক্তি বলে ঘোষণা করত। লর্ড তার প্রার্থনা বা 'হোমেজ' গ্রহণ করতেন। তাঁকে দাঁড়াতে বলে আলিঙ্গন করতেন এবং তাকে যে অধস্তন বলে গ্রহণ করেছেন তার প্রতীক হিসেবে এক-মুঠো মাটি অধস্তন-এর হাতে দিতেন। এর দ্বারা বোঝান হত যে জমিদারী শাসন করবার ক্ষমতা তাকে লর্ড দিলেন। লর্ড এবং তাঁর অধস্তন ব্যক্তির এই সম্পর্ক টিকে থাকত যতদিন উভয়েই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। একজনের মৃত্যু হলে নতুন করে আনুগত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হত। কোন অধস্তনের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হলে তার জমিদারী লর্ডের হাতে চলে যেত।

সামন্তদের দায়-দায়িত্ব। সমান্ত বা অধস্তনরা কয়েকটি দায়-দায়িত্ব পালনের শর্তে লর্ডের নিকট হতে জমিদারী পেতেন। অধস্তন জমিদার তার লর্ডকে সাহায্য করবার জন্য অনুচরদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে উপস্থিত থাকত। প্রথমে কতদিন যুদ্ধে সাহায্য করতে হবে তা নির্দিষ্ট ছিল না। পরে বছরে ৪০ দিন ধার্য হয়। এ ছাড়া অধস্তন জমিদারের আরও দায়িত্ব পালন করতে হত। লর্ড-এর সভার মাসে অন্তত একবার উপস্থিত থাকতে হত। এখানে যে বিচারকার্য চলত তাতে অংশগ্রহণ করা ছিল

আবশ্যক। তাছাড়া, জমিদারীতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বও তাকে নিতে হত। তৃতীয়ত, বৎসরে কয়েকদিন লর্ড যখন তার দলবল নিয়ে অধস্তন জমিদারের জমিদারীতে ভ্রমণে যেতেন তখন জমিদার তাঁদের আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-প্রমোদের সব ব্যবস্থা অধস্তন জমিদারকে করতে হত। তা ছাড়া লর্ডকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থসাহায্যও করতে হত। এই অর্থসাহায্যকে কর হিসেবে গণ্য করা হত না। এগুলি ছিল লর্ডকে সেবা করার একটা দিক। রাজার বা লর্ডের প্রথম পুত্রের 'নাইট' অভিষেক অনুষ্ঠানে, প্রথমা কন্যার বিবাহে এবং লর্ড যদি শত্রুহস্তে বন্দী হতেন তবে তাঁর মুক্তির জন্য অধস্তন জমিদারদের অর্থ দিতে হত। অবশ্য বিশেষ কোন কারণে লর্ড অধস্তনদের নিকট অর্থ দাবী করতে পারতেন। যেমন ধর্মযুদ্ধের সময় করা হয়েছিল।

এছাড়া জমিদারীর প্রথম বছরের আয় অধস্তন নতুন জমিদারকে দিতে হত। একে রিলিফ বলা হত। লর্ড-এর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রকেও এই কর দিতে হত উত্তরাধিকার কর হিসেবে। অধস্তন জমিদারের নাবালক পুত্রের অভিভাবককে একটা কর দিতে হত। এর নাম ছিল ওয়ার্ডশিপ। লর্ডের অনুমতি ছাড়া এবং নজরানা না দিয়ে অধস্তন জমিদার তাঁর কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারতেন না।

এইসব দায়-দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে পালন করলে অধস্তন জমিদারের জমিদারী চলে যাবার কোন ভয় থাকত না। অধস্তন জমিদার বিপদে পড়লে লর্ড তাঁকে বাঁচাতেন, অপর কোন জমিদার তার জমিদারীতে হামলা করলে লর্ড-এর সাহায্য তিনি পেতেন।

ভ্যাসালের সম্বন্ধ কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছিল না। তাঁরা উভয়েই সমাজে একই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন—অভিজাত শ্রেণী। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা যে বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়েছিল সেটি হল ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রের প্রতি নয়।

সামন্ত ব্যবস্থায় যুদ্ধকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছিল। এজন্য সামন্ত দুর্গগুলির ও বর্ম-পরিহিত সৈন্যের বিশেষ মূল্য ছিল। দুর্গগুলি গড়ে উঠেছিল সমাজকে রক্ষা করার জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য। এগুলি খুবই সুরক্ষিত ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে কেবলমাত্র সৈন্যই থাকত না, সাধারণ লোকেরাও এখানে বসবাস করতে পারত। দুর্গের প্রাচীর ৮ হতে ২৫ ফুট ঘন হত এবং এর অভ্যন্তরে প্রায় ৪৫ বিঘে জমি থাকত। শত্রুর গতিবিধি যাতে সহজেই লক্ষ্য করা যায় সেজন্য দুর্গগুলি পাহাড় বা মাটির টিলার ওপর তৈরী করা হত। দুর্গের পাথরের তৈরী প্রাচীরের বাইরে থাকত গভীর পরিখা, যাতায়াতের জন্য এর ওপর সেতু এবং ঢোকবার স্থানে লোহার শক্ত দরজা। শত্রুরা দুর্গ আক্রমণ করলে সেতুটিকে টেনে তুলে নেবার ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া দুর্গের চারদিকে

থাকত সরু সরু লম্বা জানালা। সেগুলির আড়াল থেকে শত্রুর ওপর তীর ছোঁড়া সহজ হত। যুদ্ধের সময় জমিদারের প্রজারা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে দুর্গের বেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় নিত। আর এজন্যই দুর্গগুলি মধ্যযুগে সাধারণ লোকের জীবন রক্ষায় সাহায্য করেছিল। তাছাড়া সমান্ত সমাজের প্রধান শিল্প-নৈপুণ্য ফুটে উঠেছিল দুর্গগুলির মাধ্যমে। দুর্গগুলি কেবলমাত্র লর্ড-এর বাসভবনই ছিল না, এটি জমিদারীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও ছিল। এখানে লর্ডের বিচারালয় বসত, কর সংগ্রহের হিসাবপত্র জমা থাকত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এখানেই আগমন ঘটত। জমিদারের নেতৃত্বে যে সৈন্যদল থাকত তারা প্রায় সকলেই ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকত। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল লৌহনির্মিত। তখনকার দিনে লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য ছিল খুবই বেশি। একমাত্র সামন্তরাই এই ব্যয়ভার বহন করতে পারতেন।

সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্র হিসেবে তরবারি, কুঠার, বর্শা, ঢাল ও বর্ম ব্যবহার করত। সৈন্যদের ঘোড়াগুলিও বর্ম-পরিহিত হত। এই বর্ম-পরিহিত সৈন্য তখনকার দিনে প্রায় অজেয় ছিল। বর্ম-পরিহিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাইরের কোন শত্রু সুবিধা করতে পারত না। সুতরাং একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে মধ্যযুগের কেল্লা বা দুর্গগুলি এবং বর্ম-পরিহিত সৈন্যদল ইউরোপীয় সমাজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করেছিল।

নাইট ও সিভ্যালরি প্রথা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অভিজাত বা সামন্তরা ছিলেন সমাজের শিরোমণি। তাঁরা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকেও প্রভাবিত করেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল সিভ্যালরির শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমে। 'সিভ্যালরি' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অনেকে এটিকে 'বীরব্রত' বলেছেন। বীরব্রত বলতে যা বোঝায় 'সিভ্যালরি' বলতে আরও বেশি কিছু বোঝায়। এটি ছিল মধ্যযুগের সামন্ত সমাজের জীবনাদর্শ। এর মূল কথা হল তেজস্বিতা, আনুগত্য ও বিনয়, ধর্ম, নারীর সম্মান রক্ষার জন্য জীবন দান এবং

মধ্যযুগের বর্ম-পরিহিত নাইট

দুর্গত ও অনাথদের দুঃখ মোচনে সর্বস্ব পণ। বেনেডিক্টিন ও ক্লুনির সংস্কারের দ্বারা সন্ন্যাসী জীবনে যেরূপ পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করা হয় সিভ্যালরির প্রথার মাধ্যমে অভিজাতদের জীবনেও অনুরূপ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছিল।

অভিজাত শ্রেণীর সকলেই সিভ্যালরি শিক্ষার আওতায় আসত না। তাদের মধ্যে যারা উৎসর্গীকৃত জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকে পড়ত তারাই এই শিক্ষা নিত। এদের বলা হত 'নাইট'। সিভ্যালরি হচ্ছে নাইটদের নীতি। সুতরাং নাইট ও সিভ্যালরি উত্তরাধিকারসূত্রে পাবার জিনিস ছিল না। এ দুটি অর্জন করতে হত।

সিভ্যালরি শিক্ষা শুরু হত ৭ বছর বয়স থেকে এবং চলত ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। এ শিক্ষাকালকে বলা হত পেজের শিক্ষা। তারপর যে শিক্ষা শুরু হত তাকে বলত স্কোয়ারের শিক্ষা। এ শিক্ষা ১৪ বছর হতে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত চলত। নাইট হতে হলে এ দুটি স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করতেই হত।

সিভ্যালরি শিক্ষার স্থান ছিল দুর্গের অভ্যন্তরে সামন্ত প্রভুদের সভাগুলি। দুর্গে কিভাবে কাজ করতে হবে এবং ওপরওয়ালার আদেশ মেনে চলতে হবে তা শেখান হত। সামাজিক আচার আচরণও শেখান হত। যুদ্ধবিদ্যাই ছিল প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। এই সময় হতে সাহস ও যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে বহু কঠিন পরীক্ষা দিতে হত। এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে 'নাইট' হবার উপযুক্ত বলে মনে করা হত।

নাইট অভিষেক ক্রিয়াটি জাঁকজমকপূর্ণ হত। চার্চে ধর্মযাজকের পরিচালনায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাইট উপাধি দেওয়া হত। প্রথমে ধর্মযাজক হবু নাইটকে তার নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সামরিক কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এই উপদেশ-গুলি সে জীবন পণ করেও পালন করবে বলে শপথ নিত। তারপর একটি তরবারি নিয়ে বেদির নিকটে যাজকের হাতে দিত। যাজক সেটি মন্ত্রপূত করে তার কাঁধে রেখে দিতেন। এর দ্বারা বোঝান হত চার্চকে রক্ষা করাও নাইটের অন্যতম কর্তব্য। এর-পর হবু নাইট তার প্রভুর নিকট নাইট উপাধি প্রার্থনা করত এবং প্রভু ঈশ্বরের নাম, সেণ্ট মাইকেলের নাম ও সেণ্ট জর্জের নাম উচ্চারণ করে তাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করতেন।

ত্রুবেদুর। নাইটরা ছিলেন সামন্ত শ্রেণীর অলংকারস্বরূপ। তাঁদের চরিত্রের দৃঢ়তা সমগ্র সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে নাইটদের জীবনী ও সিভ্যালরী সম্বন্ধে দক্ষিণ ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালীতে আঞ্চলিক ভাষায়

গীতি কবিতা লেখার প্রচলন হয়। শার্লেমানের ভাইপো রোলাণ্ড ও ইংলণ্ডের কাল্পনিক রাজা আর্থারের গল্প অবলম্বনে এর সূচনা। পরে সামন্তদের জীবনযাত্রা এবং শিভ্যালরীর আদর্শ নিয়েও গীত রচিত হতে থাকে। যাঁরা লিখতেন ও গাইতেন তাঁদের বলা হত 'ত্রুবেদুর'। প্রথমদিকে ত্রুবেদুরদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন রাজকুমার বা সামন্ত। ফ্রান্সের পয়তিয়ার ও একুইটেইনের সামন্ত দু'জন হলেন প্রথম ত্রুবেদুর ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড ও ত্রুবেদুর ছিলেন। রাজসভা বা সামন্তদের সভায় ত্রুবেদুররা স্বরচিত গান বাদ্য সহকারে গাইতেন। তাঁদের গান শুনে সকলেই আনন্দ পেতেন। পরবর্তীকালে যেসব চারণ কবি গ্রামে গ্রামে স্বাভাবিক সুস্থ ও আনন্দময় জীবনের গান রচনা করে গেয়ে বেড়াতেন তাদেরও ত্রুবেদুর বলা হত।

ত্রুবেদুর

ম্যানরীয় ব্যবস্থা

সামন্ত প্রথায় ভূমিই ছিল মূল সম্পদ। সে কারণে অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষির
সঙ্গে যুক্ত। তারা অবশ্য ব্যক্তিগত ভূমিখণ্ডে চাষ করত না। তারা একটি বিশেষ
পদ্ধতি বের করেছিল যাকে ম্যানরীয় পদ্ধতি বলা হয়। এক একটি বড় জমিদারী শত
শত ম্যানরে বিভক্ত থাকত। প্রতিটি ম্যানর একদিকে ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার
আঞ্চলিক বিভাগ, অপরদিকে কৃষি উৎপাদনের মূল ভিত্তি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক
দিক হতে দেখলে ম্যানরীয় ব্যবস্থাকে সামন্ত প্রথার অঙ্গ বলা যায়। ম্যানর ও ম্যানরের
বিচারালয়ের মাধ্যমে সামন্ত জমিদার ম্যানরবাসীদের ওপর তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও
সম্পত্তির ওপর অধিকার খাটাতেন। কৃষকদের প্রচণ্ড কায়িক শ্রম এবং অত্যধিক করভার
ছিল সামন্ততন্ত্রের বুনিয়াদ। সামন্তরা যুদ্ধ করতে ও দুর্গ নির্মাণ করতে ফসল তারা
তাদের প্রভুদের খামারে তুলে দিত। এইভাবে ম্যানর ছিল সামন্ততন্ত্রের অর্থনীতি বা
উৎপাদন পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

জমিদারদের প্রাসাদ বা ম্যানর হাউস গ্রামের সেরা জায়গাটিতে অবস্থিত ছিল।
জমিদার কখনো দুর্গে কখনো ম্যানর হাউসে থাকতেন। তাঁকে প্রায়ই ম্যানরের বাইরে
যেতে হত। কারণ তিনি একদিকে যোদ্ধা এবং অপরদিকে জমিদার ছিলেন। জমিদার

কেবলমাত্র একটি ম্যানরের মালিক ছিলেন না, অসংখ্য ম্যানর নিয়ে এক একটি জমিদারী গড়ে উঠত। তবে ম্যানর হাউসই ছিল তাঁর জমিদারীর আঞ্চলিক কার্যালয়। এখানে তাঁর বেলিফ স্টুয়ার্ড নামধারী কর্মচারীরাও থাকত।

ম্যানরীয় জীবন

ম্যানর কোর্ট বা বিচারালয়। প্রতি ম্যানরে একটি করে বিচারালয় ছিল। ম্যানরের অধিবাসীদের প্রত্যেককে এখানে হাজিরা দিতে হত। চার্চ বা ম্যানর হাউসের হলঘরে বিচারালয় বসত। এখানে জমিদারদের সম্পত্তির অধিকার এবং গ্রামবাসীদের প্রথা অনুযায়ী অধিকার নির্ধারণ করে বিচারকার্য চালানো হত। ম্যানরের প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে জানবার জন্য কৃষকদের ডাকা হত এবং স্থানীয় প্রথা ভঙ্গকারীর শাস্তির মাত্রা ঠিক করা হত। বিচারের সিদ্ধান্ত জানানো হত গোটা ম্যানরের নামে। এই বিচারালয় হতে যে জরিমানা আদায় হত তা ছিল জমিদারের প্রাপ্য। মধ্যযুগে ব্যক্তিগত রেষারেষি তীব্র ছিল। কিন্তু এই ম্যানর কোর্ট ব্যক্তিগত রেষারেষি বা খুনোখুনি অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হয়েছিল। তখনকার দিনে ম্যানর কোর্টগুলির লিখিত রেকর্ড হতে জানা যায় অন্ধকারে কেউ কাউকে তীর ছুড়েছে, পচা মদ বিক্রি করেছে বা আপেল চুরি করেছে, তার জন্য শাস্তি পেয়েছে। এমনকি কেউ কাউকে গালিগালাজ দিলেও যে শাস্তি পেত তারও উল্লেখ আছে। এগুলি হতে বোঝা যায় যে ম্যানর কোর্টগুলি গ্রামের সমাজ জীবনে শুধু শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে চেষ্টাই করেনি, সভ্য জীবন যাপনে তাদের অভ্যস্ত করার জন্য সচেষ্ট ছিল।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এক একটি ম্যানরে প্রায় এক হাজার একর জমি থাকত। কারণ এই পরিমাণ জমি না থাকলে ম্যানরের অধিবাসীদের পক্ষে দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হত না এবং জমিদারের পক্ষেও সামন্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হত। অর্থনৈতিক দিক হতে ম্যানরগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি ম্যানরেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হত।
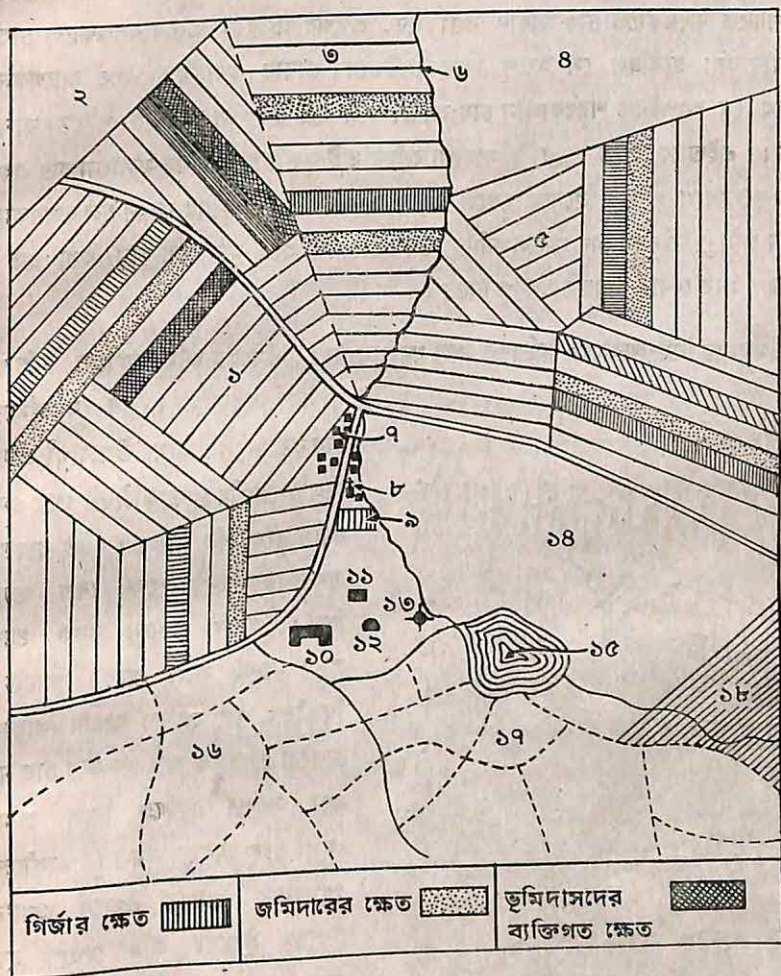
একটি আদর্শ ম্যানরের নক্সা

১. বসন্তকালে চাষযোগ্য জমি। ২. অকৃষিযোগ্য জমি। ৩. হেমন্তে আবাদযোগ্য জমি। ৪. বনভূমি। ৫. সাময়িকভাবে ফেলে রাখা জমি। ৬. নদী। ৭. চাষীদের কুটির। ৮. গির্জা ও যাজকের বাসস্থান। ৯. দেবোত্তর জমি। ১০. ম্যানর হাউস। ১১. জমিদারের গোলাবাড়ি। ১২. রুটি তৈরীর উনান। ১৩. গম পেষাবার যাঁতাকল। ১৪. পশুচারণভূমি। ১৫. পুকুর। ১৬. জমিদারের খাস জমি। ১৭. তৃণভূমি। ১৮. জলাভূমি।

প্রতি ম্যানরের প্রধান সম্পদ ছিল চাষভূমি। ম্যানরের সমগ্র জমির অর্ধেকেরও বেশি ছিল ফসল ফলাবার জমি। চাষভূমি আবার তিনটি শ্রেণী বা ভাগে বিভক্ত ছিল। একে বলে ত্রয়ী ব্যবস্থা বা তেভাগা ব্যবস্থা। কোন বছরে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণীতে বসন্তকালে চাষ-আবাদ করা হত; দ্বিতীয় ভাগে শরৎকালে চাষ-আবাদ হত এবং তৃতীয় ভাগটিকে পতিত রাখা হত। পরের বছর আগেকার বছরের পতিত অংশটিতে বসন্তকালে চাষ-আবাদ করা হত, আগের বছরে যে অংশে বসন্তকালে চাষ-আবাদ করা হয়েছিল সে অংশে শরৎকালীন চাষ-আবাদ করা হত এবং আগেকার বছরে যে অংশটিতে শরৎকালীন চাষ-আবাদ করা হয়েছিল সে অংশটি পতিত রাখা হত। এইভাবে প্রতি বছর কৃষিযোগ্য জমির দুই-তৃতীয়াংশে ফসল ফলানো হত এবং এক-তৃতীয়াংশ পতিত হিসেবে ফেলে রাখা হত। এরূপ করার কারণ হল তখনকার দিনে জমি প্রতি বছর চাষ করলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় বলে মনে করা হত। জমিতে সার দেবার ব্যবস্থা তখনও চালু হয় নি।

ম্যানরে চাষ-আবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল ফালি প্রথা। কৃষকের জমির কোনো নির্দিষ্ট সীমানা থাকত না। সে যে জমিতে চাষ করতে পেত চাষের উপযোগী জমির তিনটি শ্রেণীর প্রত্যেকটিতেই তার এক ফালি করে জমি থাকত। এই ব্যবস্থা তখনকার দিনের পক্ষে বেশ ভাল ছিল। কারণ একজন কৃষক প্রায় সারা বছরই কাজ করতে পারত। দ্বিতীয়ত, গরু বলদের অভাব থাকায় চাষীরা প্রত্যেকে আলাদা করে চাষ না করে সকলে একসঙ্গে মিলে জমিগুলি চাষ-আবাদ করত। চাষীদের প্রত্যেককে গ্রামের এখানে ওখানে টুকরো টুকরো জমি দেওয়া হত বলে সমস্ত ভাল বা মন্দ জমি কোন একজনের ভাগে পড়ত না। এক অংশে ফসল না হলে অপর অংশে হত এবং চাষী অনাহারের হাত হতে বাঁচত। প্রতি ম্যানরে লর্ড-এর খাস জমি থাকত। এই জমির পরিমাণ

জমিদারদের বেগার দিতে ব্যস্ত ভূমিদাসগণ (কভি)।

ছিল গোটা ম্যানরের আবাদযোগ্য জমির এক-তৃতীয়াংশ। ভূমিদাসদের এই জমিতে বিনা মজুরিতে চাষ-আবাদ করে দিতে হত। ভূমিদাসদের কি কাজ করতে হত তা আগে থেকে সে জানত না। তবে পরবর্তী কালে ঠিক হয়েছিল যে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন তাকে দুটি বলদ নিয়ে জমিদারের চাষভূমিতে বেগার দিতে হবে। এ ছাড়া ফসল তোলবার সময় চাষীকে জমিদারের জন্য আরও বেশী সময় দিতে হত। একে সেবাকার্য নাম দেওয়া হয়েছিল। এ কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল বন হতে ম্যানর হাউসে কাঠ এনে দেওয়া, জমিদারের খামার বাড়িতে শস্য পেঁছে দেওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া চাষীকে আর একপ্রকার বেগার দিতে হত। এই কাজকে বলা হত কর্ভি। রাস্তা তৈরীতে সাহায্য করা, জলাভূমি পরিষ্কার করা, সাঁকো তৈরীতে সাহায্য করা, খাল কাটা প্রভৃতি কাজ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর জন্য কোন মজুরি সে পেত না। ভূমিদাসদের স্ত্রী ও ছেলেমেদের আদেশ করলেই ম্যানর হাউসে কাজ করতে হত। ভূমিদাসকে তার কাজ করার সমগ্র সময়ের অর্ধেকের বেশিই ব্যয় করতে হত জমিদারের সেবায়। গ্রামের পুরোহিতের জন্যও জমি বরাদ্দ ছিল। একে দেবোত্তর জমি বলা যায়।

চাষ-আবাদের জমি ছাড়াও প্রতিটি ম্যানরে বনভূমি ও চারণ-ভূমি থাকত। বনভূমি হতে চাষীরা জ্বালানি সংগ্রহ করত এবং চারণভূমিতে গরু ভেড়া ইত্যাদি চড়াতে পারত। ম্যানরের লোকদের ব্যবহারের জন্য পুকুর, নদী বা খাল ছিল। এখান হতে তারা পানীয় জল পেত। ম্যানরের একটি ক্ষুদ্র অংশে ছিল লোকবসতি। এছাড়া প্রত্যেক ম্যানরে ছিল ম্যানর হাউস বা জমিদারের প্রাসাদ, গির্জা ও যাজকের বাসস্থান, শস্য পেষাবার কল, রুটি বানাবার উনুন। জমিদার এগুলির মালিক ছিলেন। কৃষকরা 'ফি' দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় নিজ নিজ কাজ করে নিত।

চাষীদের দায়দায়িত্ব। চাষীদের অধিকাংশই ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস। তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। চাষীদের উৎপন্ন শস্যের অধিকাংশই জমিদার নানাভাবে নিয়ে নিতেন। চাষীদের জন্য যে জমি বরাদ্দ ছিল জমিদার সে সব জমির খাজনার বিনিময়ে শস্য নিতেন। এর পরিমাণ ছিল উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক। সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন তাদের বিনা মজুরিতে জমিদারের খাস জমি চাষ করে দিতে হত। বনভূমিতে শিকার করা বা কাঠ কুড়ানো অথবা নদীতে, খালে বা পুকুরে মাছ ধরতে গেলে তাদের কর দিতে হত। জমিদারের রাস্তা বা সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করতে ও জমিদারের জাঁতাকলে গম পেষাতে কর লাগত। প্রতি বছর জমিদারকে বস্ত্র, জুতো, মোম, মধু তাদের বিনামূল্যে জোগান দিতে হত। একে মাথাপিছু কর বলা হত। এই কর খুব ঘৃণ্য ছিল, কারণ এ কর দেওয়ার অর্থই হল দাসত্ব মেনে নেওয়া। তাছাড়া বছরের উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় জমিদারকে সাধ্যমত ভাল ভাল জিনিস উপহার দিতে

হত। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রকে উত্তরাধিকার কর (হেরিয়ট) প্রত্যেক ভূমিদাসকে দিতে হত। এটা জিনিসের মাধ্যমে দেওয়া যেত। যেমন একটা চেয়ার বা সবচেয়ে ভাল গরু। এ ছাড়া দেশের রাজাকে কর ও চার্চের প্রাপ্য মেটাতে হত। সুতরাং ক্রীতদাস না হয়েও চাষীদের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়।

ম্যানরে চাষীদের জীবনযাত্রা। ম্যানরে লোকসংখ্যা ছিল কম। খোলা মাঠের ভেতর বা সরু রাস্তার দু'পাশে চাষীরা তাদের কুটির বানাত। সাধারণতঃ তাদের কুটিরগুলিতে দুটির বেশি ঘর থাকত না। ঘরগুলি হত মাটির ও খড়ে ছাওয়া। কখনো কখনো চাষীরা কাঠের বাড়িও তৈরী করত।

শাক-সব্জি ও মোটা রুটি ছিল চাষীদের প্রধান খাদ্য। ডিম ও মাংস বিশেষ

জুটত না। বাড়িতেই তারা শাক-সব্জি ইত্যাদি লাগাত এবং ছাগল, মুরগি এবং শুয়োর পুষত খাদ্যের জন্য। শীতকালে শাক-সব্জি হত না। তারা মাংসে নুন মাখিয়ে শীতকালের জন্য রেখে দিত। মেয়েরাও পুরুষদের মত সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটত। তারা নিজ নিজ ঘরে সুতো কেটে কাপড় বুনত।

চাষীরা গ্রামের গীর্জায় উপাসনা করত। ধর্মযাজকদের নির্দেশ অনুসারে রবিবার ও পবিত্র দিনে কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের জীবনে আমোদ-প্রমোদ ছিল না বললেই হয়। মাঝে মাঝে এক ম্যানরের সঙ্গে অপর ম্যানরের কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি চলত। কুস্তির দিন সকলে গির্জার প্রাঙ্গণে জমা হত। নাচ, গান, আর নানারকম আমোদ-প্রমোদ চলত। কোথাও মেলা বসলে অবশ্য কেউ কেউ মেলায় যেত। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা ছিল না। ধর্মযাজক, জমিদার ভবঘুরের মুখে যা গল্প শুনত তা দিয়ে তারা তাদের জ্ঞানের জগৎ সৃষ্টি করত। পরে মুখে মুখে তারা রূপকথার কাহিনী ও উপাখ্যান এবং গাথা সঙ্গীত বলতে পারত। রবিনহুডের কাহিনী তাদের নিকট খুবই প্রিয় ছিল। রবিনহুডের চরিত্রে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে বলে তারা মনে করত।

ম্যানরীয় দুর্গে জীবনযাত্রা। ম্যানরের প্রভু হতেন জমিদার, নাইট বা অভিজাত।
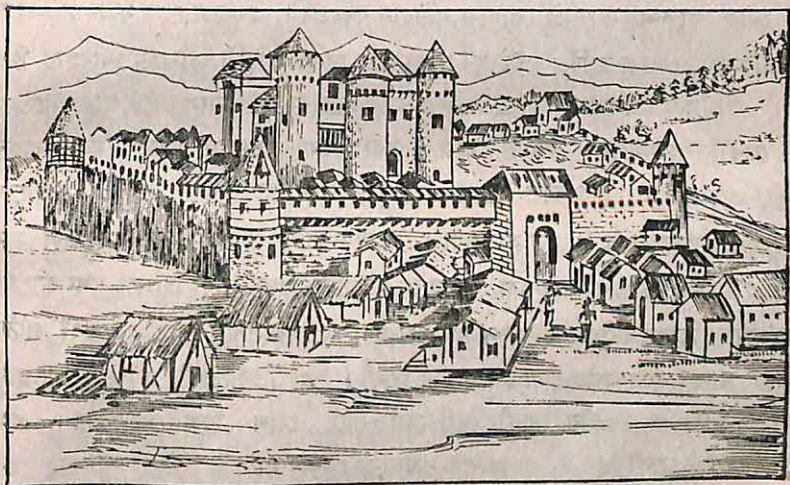
ম্যানরীয় দুর্গ

তিনি একদিকে যোদ্ধা এবং অপরদিকে জমিদার ছিলেন। সামন্ত প্রথার বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হত। যখন এগুলি হতে অব্যাহতি পেতেন সে সময়টা কাটাতেন শিকারে। চাষবাসে তাঁর মোটেই আগ্রহ থাকত না। এ কাজ সার্ফরাই করত। জমিদারের খরচ খরচাও কম ছিল না। নাইট হিসেবে তাঁকে অনুচর পুষতে

হত, পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় ছিল, বড় জমিদার বা লর্ডকে সামন্ত প্রথা অনুযায়ী অর্থ বা অন্যান্য জিনিসপত্র দিতে হত। সবশেষে খামার বাড়িতে রাখতে হত শস্যপূর্ণ গোলা। কোন বছর শস্যহানি হলে কৃষককে বেঁচে থাকবার জন্য শস্য দিতে হত। অনাহারে তাদের মরে যেতে দেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ চাষী বা সার্ফ না থাকলে জমিদার থাকে না।

দুর্গে ম্যানরীয় জীবন খুব বিচিত্র ধরনের ছিল। দুর্গে কয়েকটি শোবার ঘর ও মাঝখানে থাকত বিরাট হল ঘর। জানালাগুলি ছিল খুবই ছোট ছোট। এ কারণে দুর্গের অভ্যন্তরে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশ করত না। মোমবাতি বা মশালের আলোর ব্যবস্থা ছিল।

ঘরের দেওয়ালে নানারকম নক্সা-করা সুন্দর সুন্দর পর্দা থাকত। বড় জমিদার কখনো কখনো এলে দুর্গে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হত। তাছাড়া উৎসব অনুষ্ঠানে ভোজের আয়োজন করা হত। ভোজের প্রধান অঙ্গ ছিল সুরা এবং শুয়োর, মেষ বা গো-মাংসের রোষ্ট। ভাঁড়ের ব্যঙ্গ-কৌতুক ও চারণের গান তাঁরা শুনতে ভালবাসতেন। ত্রুবেদুররা এই গান করতেন। তা ছাড়া মল্লযুদ্ধ, পশু শিকার, বাজিকরের খেলা দেখতে জমিদাররা ভালবাসতেন।

জমিদাররা পশমের মোটা পোষাক পরিধান করতেন। খেতেন প্রচুর ফলমূল, শাক-সব্জি, মাংস ও সাদা রুটি। ইটালী ছাড়া আর কোথাও কাঁটা চামচের ব্যবহার ছিল না। অতিথি অভ্যাগতরা সকলেই নিজের নিজের ছোরা দিয়ে মাংস কেটে তুলে নিতেন।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। সামন্ত সমাজ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—যাজক শ্রেণী, জমিদার বা অভিজাত শ্রেণী এবং কৃষক শ্রেণী বা সাধারণ শ্রেণী। মধ্যযুগে মানুষের আত্মার রক্ষক ছিলেন যাজকরা। যেহেতু দেহের চেয়ে আত্মা বড় বলে মনে করা হত, সে কারণে যাজকরা মধ্যযুগের সমাজে প্রথম শ্রেণী হিসেবে গণ্য হতেন। অভিজাতরা ছিলেন জীবন ও সম্পত্তির রক্ষক। তাঁদের নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী গঠিত ছিল। বাদবাকি সকলকে বলা হত তৃতীয় শ্রেণী। এই তিন শ্রেণীর জীবন ছিল ছকে বাঁধা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দায়িত্বের চেয়ে বেশি ছিল অধিকার। এরা সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল। অপরদিকে কৃষকদের কেবল দায়িত্বই ছিল, অধিকার বলে কিছু ছিল না। মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগই ছিল তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সমাজে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। স্বভাবতই তৃতীয় শ্রেণীর লোকেদের বিশেষ করে কৃষকদের স্বার্থ ও জমিদারদের স্বার্থ ছিল পরস্পর বিপরীত। জমিদাররাই কৃষকদের সর্বদিক হতে শোষণ করতেন। যাজকদের সঙ্গে কৃষকদের স্বার্থ সংঘাত দেখা দেয়নি। বরঞ্চ গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন তাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দের উৎস।

সুতরাং পরে যে শ্রেণী সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল সেটা ছিল জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সার্ফ বা ভূমিদাস। ইউরোপের সর্বত্র একই প্রকারের ম্যানরীয় প্রথা ছিল না। তবে কৃষকদের অবস্থা সব ম্যানরগুলিতেই একইরকম ছিল। কৃষক সার্ফ হিসেবে জন্মগ্রহণ করত, কারণ সার্ফ প্রথা ছিল বংশগত। পিতা সার্ফ হলে পুত্রও সার্ফ হিসাবে গণ্য হত। ম্যানরে স্বাধীন কৃষক যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। তাই ভূমিদাস বা সার্ফরাই চাষ করে খাদ্য উৎপাদন করে সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সার্ফ বা ভূমিদাসদের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল তা বলা শক্ত। তবে অনেকের মতে রোমান আমলে যারা দাস ছিল তারাই প্রথম ভূমিদাসে পরিণত হয়। তা ছাড়া মধ্যযুগে বলা হত জমি ছাড়া প্রভু নেই, প্রভু ছাড়া জমি নেই। জমির আসল মালিক ছিল সামন্ত প্রভুরা। স্বভাবতই সমাজে এদের সংখ্যা ছিল কম। আর সার্ফদের সংখ্যা ছিল বেশী। আইনের চোখে সার্ফ ছিল জমিদারদের আশ্রিত জীব (চ্যাটেল) এবং গবাদি পশুর চেয়ে তার মর্যাদা বেশি ছিল না। সাধারণতঃ সার্ফের পক্ষে কোন সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল না। তারা নিজ নিজ ইচ্ছা বা আগ্রহ অনুযায়ী কিছু করতে পারত না। তারা জমি ছেড়ে চলে যেতে পারত না। জমি বিক্রি হলে তারাও জমির সঙ্গে বিক্রি হয়ে যেত। প্রভুর অনুমতি ছাড়া পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে পারত না। তাদের স্ত্রী ও কন্যা প্রভুর গৃহে বিনা মজুরিতে গৃহস্থালীর কাজ করত।

ভূমিদাসের জীবন ছিল অভিশপ্ত। এই জীবন হতে মুক্তি পাওয়া সহজ ছিল না। তবে ভূমিদাস যদি চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকত তাহলে সে আর ভূমিদাস থাকত না। সে যাজক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হত।

দ্বিতীয়ত, ভূমিদাসদের শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এর কারণ হ'ল শহরগুলি জমিদারদের অধীনে ছিল না। কোন ভূমিদাস শহরে পালিয়ে যেতে পারলে সে তার ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেত। শহরে যেতে পারলে কাজের অভাব হত না। শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল শহরগুলি। ম্যানর হতে পালিয়ে আসা ভূমিদাসদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসা ও বণিক বৃত্তি গ্রহণ করত। তারা আর ভূমিদাস থাকত না, তাদের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হত। এ কারণে মধ্যযুগে শহরের হাওয়াকে স্বাধীনতার হাওয়া বলা হত। সবশেষে ভূমিদাস হতে মুক্তি পাবার জন্য কখনো কখনো ভূমিদাসরা বিদ্রোহের পথ বেছে নিত। এই শ্রেণীসংগ্রাম কখনো গুপ্তভাবে কখনো প্রকাশ্যে ঘটত। ভূমিদাসরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দিত, পুড়িয়ে দিত জমিদারের খামার বাড়ি এবং কখনো কখনো জমিদারদের হত্যা করতেও পিছপা হত না।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

ইউরোপ ও এশিয়াতে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মযুদ্ধগুলি ১০৯৫ হতে ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে: ঘটেছিল সেগুলিকে সাধারণভাবে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। এই সময়ের মধ্যে বহুবার ক্রুসেড হয়েছে। তবে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম ক্রুসেডে যে সকল খ্রীষ্টান বীর যোগ দিয়েছিল তাঁদের বহির্বাসে খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক ক্রস চিহ্ন থাকত। এজন্য এই যুদ্ধ 'ক্রুসেড' নামে পরিচিত।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম ও মৃত্যু হয় যথাক্রমে প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত বেথেলহেম ও জেরুসালেমে। সুতরাং এই স্থান দুটি ছিল প্রতিটি ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানের নিকট অতি পবিত্র। প্রতি বছর হাজার হাজার খ্রীষ্টান তাঁদের এই পুণ্যভূমিতে তীর্থ করতে যেতেন। ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পর আরবরা প্যালেস্টাইন জয় করে নেয়। তারা কিন্তু খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ধর্মানুষ্ঠানে কোনপ্রকার বাধা দিত না। বরঞ্চ তীর্থযাত্রীদের যে কর দিতে হত তা হতে তাদের বেশ আয় হত। আরবদের পর তুর্কী জাতীয় মুসলমানরা প্যালেস্টাইন দখল করে। তাদের আমলে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর নানাপ্রকার অত্যাচার শুরু হয়। পিটার নামে একজন সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীদের দুরবস্থার কথা ইউরোপে প্রচার করেন। তিনি খ্রীষ্টানদের বিধর্মীদের হাত হতে পবিত্র তীর্থস্থান উদ্ধার করতে আহবান জানান। খ্রীষ্টান যাজকদের নায়ক পোপও তখন উদাসীন থাকতে পারলেন না। তিনি প্যালেস্টাইনের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এইভাবে ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের তুর্কী শাসনকর্তার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ক্রুসেডে যোগদানের পিছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য। ইউরোপের বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ক্রুসেডে যোগ দেয়। তারা সকলে যীশুর জন্মস্থান উদ্ধারের কথা বললেও আসলে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধিই ছিল ক্রুসেডে যোগদানের প্রেরণা। ইউরোপের খ্রীষ্টান বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য উৎসাহী ছিল। এই বণিককুল বাইজাণ্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্যের বন্দরগুলিতে যেতে পারত না। এইসব অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য মুসলমান বণিকরাই নিয়ন্ত্রণ করত। খ্রীষ্টান ইউরোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ যাতে ঘোষণা করে তার জন্য খ্রীষ্টান বণিককুল চেষ্টা করে এবং তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এই যুদ্ধ যখন সত্য-সত্যই শুরু হল তখন কিন্তু এরা ধর্মীয় মনোভাবের পরিচয় দিল না। তাদের আসল

উদ্দেশ্য তখন ধরা পড়ে যায়। খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ এই ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। তিনি এটিকে "ঈশ্বরের ইচ্ছা" বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। তিনি ধর্মযুদ্ধের দ্বারা রোমান চার্চ তথা পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখলেন। গ্রীক চার্চের কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। ধর্মীয় ব্যাপারে পোপের কর্তৃত্ব গ্রীক চার্চের যাজক ও অনুগামীরা মানত না। ধর্মযুদ্ধের ফলে পোপের কর্তৃত্ব তারা মানতে বাধ্য হবে বলে পোপ মনে করলেন। আর এটা সম্ভব হলে ক্লুনি সংস্কারের দ্বারা পোপকে রাজা ও রাষ্ট্রের ওপরে স্থাপন করার যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল তাও সফল হবে বলে মনে করা হল।

সামন্ত শ্রেণী বিশেষ করে নাইটরা ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সম্পদ লুণ্ঠন ও রাজ্যজয়ের জন্য। ভূমিদাসরা এতে যোগ দেয় তাদের ভূমি দাসত্ব হতে মুক্তি পাবার জন্য। তাদের ওপর যে দায়-দায়িত্ব ছিল তা বহন করা তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে ধর্মযুদ্ধের ডাক শুনেই তারা দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় এবং প্যালেস্টাইন দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

প্রথম ক্রুসেড। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লেরমণ্ট (দক্ষিণ ফ্রান্স) পরিষদে পোপ দ্বিতীয় আরবান সমবেত সামন্তদের ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য আহবান জানান এবং এর সঙ্গে

ক্লেরমণ্ট ধর্মীয় পরিষদে ভাষণরত পোপ দ্বিতীয় আরবান

সঙ্গে প্রথম ক্রুসেড শুরু হয়। পোপ তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে যারা এতে অংশ গ্রহণ করবে তারা সমস্ত পাপ হতে মুক্তি পাবে ও প্রচুর সম্পদের

অধিকারী হবে। সামন্ত ও নাইটরা এই যুদ্ধে যোগদানের পূর্বেই ভূমিদাসদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী প্যালেস্টাইনের দিকে যাত্রা করে। পথে লুটতরাজ করতে করতে তারা কনস্টাণ্টিনোপলে পৌঁছায়। সন্ন্যাসী পিটার তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কনস্টাণ্টিনোপলে তারা বেপরোয়া লুটপাট করতে থাকলে বাইজাণ্টাইন সম্রাট তাদের সেখান হতে বহিষ্কৃত করেন। তারপর তারা নাইসিয়া আক্রমণ করলে তুর্কীদের হাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইতিমধ্যে সামন্ত ও নাইটদের দ্বারা গঠিত বাহিনী প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হয় এবং ঝটিকাগতিতে জেরুসালেম দখল করে নেয়। সেখানকার মুসলমান অধিবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এর পরে অন্যান্য স্থানে তুর্কী বাহিনীকে পরাজিত করে জেরুসালেমে একটি খ্রীষ্টান রাজ্য স্থাপন করা হয়। ফ্রান্সের এক সামন্ত এই রাজ্যের রাজা নির্বাচিত হলেন। এখানে সামন্ত প্রথা প্রবর্তন করা হল। এ ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট খ্রীষ্টান রাজ্য এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে। এই রাজ্যগুলির সঙ্গে জেনোয়া, পিসা এবং ভেনিস প্রভৃতি ইটালীর বণিক-শাসিত নগর-গুলির খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লোহিত সাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য তারা হস্তগত করবার চেষ্টা করে।

তৃতীয় ক্রুসেড। এর পর ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের বিখ্যাত সুলতান সালাদিন জেরুসালেম জয় করেন এবং তাঁর পরাক্রমে সেখানকার খ্রীষ্টান রাজ্য বিপন্ন হয়। তখন ইউরোপে খ্রীষ্টান সামন্ত এবং রাজারা আবার তাদের তীর্থস্থান রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ

ক্রুসেডের রণক্ষেত্রে জীবন মরণ সংগ্রাম

হলেন। এইভাবে তৃতীয় ক্রুসেড আরম্ভ হয় (১১৮৯ খ্রীঃ)। এটাই সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রুসেড। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড ও ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এতে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু খ্রীষ্টান রাজাদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় ক্রুসেডাররা জেরুসালেম উদ্ধারে ব্যর্থ হন। তৃতীয় ক্রুসেডের সমাপ্তির সঙ্গে ধর্মযুদ্ধের সুবর্ণ যুগের অবসান ঘটে। এর পর যে

ক্রুসেডগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিকে নামমাত্র ক্রুসেড বলা হয়। এগুলির সঙ্গে ধর্মের নামগন্ধ ছিল না। লুণ্ঠন মনোবৃত্তিই এগুলিকে পরিচালিত করেছিল। চতুর্থ ক্রুসেডে এটি স্পষ্টভাবে দেখা গেল।

চতুর্থ ক্রুসেড। চতুর্থ ক্রুসেড শুরু হয় ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে। এটি দু'বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই ক্রুসেডে নাইটরা বেশি সংখ্যায় যোগদান করে। পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট এই ক্রুসেডের ওপর প্রভাব স্থাপনে ব্যর্থ হন। ক্রুসেডারগণ শুধু গ্রীক শহরগুলিই লুণ্ঠন করে নি, কনস্টাণ্টিনোপল দখল করে শহরে অগ্নিসংযোগ করে এবং কয়েকদিন ধরে কনস্টাণ্টিনোপল লুণ্ঠন করে। তাদের এই কার্যকলাপ প্রমাণ করল যে ক্রুসেডের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যীশুর জন্মস্থান উদ্ধার করা নয়, খ্রীষ্টান শহরগুলি লুণ্ঠন করা। এর কিছুকাল পরেই তুর্কীরা ক্রুসেড যোদ্ধাদের এশিয়া মাইনর হতে তাড়িয়ে দেয়। ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ক্রুসেডের প্রভাব। ক্রুসেডের মূল উদ্দেশ্য সফল না হলেও ধর্মযুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি লাভবান হয়েছিল। ক্রুসেডের অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশের রাজা ও সামন্তরা বহু নগরকে স্বাধিকার দান করেছিলেন; ফলে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে স্বায়ত্তশাসনমূলক নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা আসে। ইটালীতে নগর-রাজ্যগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই সময় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী প্রদেশগুলির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল বলেই ঐ অঞ্চলে ইটালীর নগরগুলির বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব হয়েছিল। এ থেকেই পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের সমুদ্রযাত্রার সম্ভাবনা সূচিত হয়। ভেনিস ও জেনোয়ার বাণিজ্য-পোতগুলি অনায়াসে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সহিত সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ক্রুসেডের ফলে নগরগুলির উদ্ভব ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই নগরগুলির আবির্ভাবে সামন্ত ও কৃষক শ্রেণীর কোন অবদান ছিল না। সামন্ত সমাজে যাদের বিশেষ স্থান ছিল না তারাই এই নগরের হর্তাকর্তা হন। বণিক সম্প্রদায়, আইনজীবী, শিল্পী, কারিগররা হলেন নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ক্রমেই এই শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাত্রা প্রণালী সামন্ত প্রথার অবসান ঘটাতে সহায়ক হয়েছিল।

ক্রুসেডের ফলে চার্চ তথা পোপের ক্ষমতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। ধর্মভীরু লোকের সংখ্যা কমে যেতে থাকে এবং ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব দেখা দেয়। ক্রুসেডের ফলে সামন্ত প্রথার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সামন্তরা ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। এর জন্য তারা জমিদারী বন্ধক বা বিক্রি করেছিল এবং অর্থের

বিনিময়ে বহু ভূমিদাসকে মুক্তি দিয়েছিল। এ ছাড়া ধর্মযুদ্ধে বহু সামন্ত মারা যায়, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং জনসাধারণের মনে কিছুটা জাতীয়তাবাদের উদয় হয়। ফলে সামন্তদের পূর্বেকার ক্ষমতা আর রইল না। সামন্তদের দুর্বলতার সুযোগে রাজারা তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পেলেন। ক্রুসেডের অজুহাত দেখিয়ে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের রাজা নিজ নিজ রাজ্যের অভিজাত শ্রেণী হতে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণীর ওপরই প্রত্যক্ষ কর বসাতে সক্ষম হলেন। এর আগে রাজার পক্ষে এরূপ কর বসানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং ক্রুসেডের ফলে রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

ক্রুসেডের ফলে ইউরোপীয় সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করে। সে যুগে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, সম্পদ ও শিল্পকলায় ইউরোপ অপেক্ষা এশিয়া ছিল অনেক উন্নত। তখন কনস্টান্টিনোপল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। শান্তির সময় প্রাচ্য দেশের সঙ্গে ইউরোপীয়দের বিশেষ পরিচিতি ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ করতে এসে তারা এশিয়ার সমৃদ্ধি ও সভ্যতার পরিচয় পেল। ফলে একদিকে যেমন তাদের নিজ নিজ দেশে নতুন নতুন বিদ্যাচর্চার সূচনা হল, তেমনি এই অঞ্চলের উন্নততর কৃষিব্যবস্থা ও হস্তশিল্পের কারিগরি মান তারা গ্রহণ করেছিল।

ক্রুসেডের ফলে ইউরোপীয়দের সামাজিক জীবনেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। গ্রীক ও আরবদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ইউরোপীয়দের দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল। ইউরোপে প্রাচ্যের খাদ্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটল।

কৃষক ও হস্তশিল্পের পৃথকীকরণ। ক্রুসেডের ফলে শহর ও ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শহরাঞ্চলের এই উন্নতির ফলে শিল্প ও চাষ-আবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিল। পূর্বে চাষী বা তার পরিবারের লোকেরা শিল্পকর্ম করত। তারাই কামার, তাঁতি, ছুতোর ও মুচির কাজ করত। কিন্তু যখন তারা বুঝল যে এইসব কাজে সর্বক্ষণ সময় দিয়ে তারা কৃষির চেয়ে বেশি রোজগার করতে পারবে তখনই তারা কৃষিকার্যে কম সময় দিয়ে বেশি সময় দিতে লাগলো এইসব শিল্পকর্মে। প্রথমেই কৃষিকর্ম তারা একেবারে ছেড়ে দিতে পারল না ; ম্যানর প্রথা অনুযায়ী এটা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু শহরগুলির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবার ফলে তারা নিজ নিজ ম্যানর ছেড়ে শহরে চলে এল। শহরে সামন্তদের কোন ক্ষমতা ছিল না। এখানে তারা স্বাধীন কারিগর হল। ক্রুসেডের ফলে কেবলমাত্র শহর ও শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি, কৃষিকর্ম থেকে হস্তশিল্প পৃথক হয়ে যায়। ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক প্রগতি সহজতর হয়।

নবম অধ্যায়

শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ

শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ। মধ্যযুগে শহরের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে তা বলা শক্ত। কোন একটা সাধারণ নিয়মে শহরগুলি গড়ে ওঠে নি। তবে এটা ঠিক যে, সামন্তদের দুর্গগুলি অনেক ক্ষেত্রে শহর গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। সামন্ত দুর্গগুলি তখনো পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল না। সম্ভাব্য বিপদের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য কাঠ দিয়ে এগুলি ঘেরা থাকত। তৎকালীন দলিল দস্তাবেজে এগুলিকে 'বুর্গ' বা 'বার্গ' বলা হয়েছে। এর অর্থ হল সুরক্ষিত স্থান, দুর্গ নয়। এগুলিকে আবার 'আর্বস' ও বলা হয়েছে। 'আর্বস' কথাটির অর্থ হল শহর। ইউরোপে নবম ও দশম শতকে ডিউক, কাউণ্ট, মারগ্রেভ উপাধিধারী সামন্তরা অনেক বুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। নর্সমেন, ডেন, শ্লাভ এবং মুসলমানদের আক্রমণের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য এগুলির প্রয়োজন ছিল। এই বুর্গগুলিকে শহর না বলা গেলেও এগুলিকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে অনেক শহর গড়ে ওঠে।

বুর্গে চাষবাসের জন্য বহু চাষী এসে উপস্থিত হয়। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বুর্গে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল বলে তারা অবসর সময়ে হস্তশিল্পে মন দিতে পারত। কাঠের আসবাবপত্র তৈরি, চামড়ার কাজ, সুতা কাটা, কাপড় বোনা এবং কুমোরের কাজে তারা ব্যস্ত থাকত। এসব জিনিসের চাহিদাও ছিল। তাদের হস্ত-শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় ও বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রয় করবার জন্য বণিকদের যাতায়াত বাড়ল। কোন কোন বণিক স্থায়িভাবে বুর্গে থেকে গেল। বণিকরা চাষী ছিল না। ফলে বুর্গের সমাজে নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। ইতিমধ্যে চাষীদের মধ্যেই অনেকে চাষবাস ছেড়ে কামার, ছুতোর, দর্জি, মুচি, তাঁতি, রুটি প্রস্তুতকারক ও কসাই-এর কাজে নিজেদের নিয়োগ করল। তাদের পণ্যসামগ্রী সহজেই বিক্রী হয়ে যেত। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে তারা তাদের চাহিদামত খাদ্যশস্যও পেতে থাকল। ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে বুর্গের বেষ্টনের সীমাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

একাদশ শতকে বিশেষ করে ক্রুসেডের ফলে শহরের সংখ্যা ও শ্রীবৃদ্ধি দুই-ই ঘটেছিল। ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্যদেশে যাতায়াত খুব বেশি চলতে থাকে। ফলে ব্যবসা-

বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ইটালীর শহরগুলির বণিকরা ক্রমেই বিত্তশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।
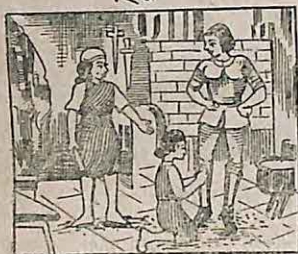
বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ

পতিত জমি উদ্ধার

ব্যবসার প্রসার

শহরের সঙ্গে জিনিষপত্রের আদানপ্রদান

জমিদারদের প্রভুত্ব হতে মুক্তির প্রচেষ্টা
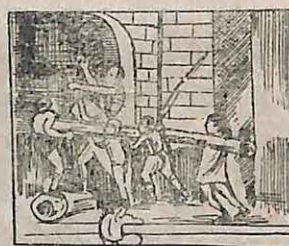
জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ

শহরে বণিক ও শিল্প সংঘ। শহরবাসীরা অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্যে ও নানা-রকম শিল্পকাজে নিযুক্ত থাকত। প্রত্যেক শহরের বণিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য একটি করে সংঘ গড়ে তুলত। এগুলিকে বলা হত 'ট্রেড-গিল্ড' বা বণিক সংঘ। ক্রমে শহরের আয়তন এবং লোকসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। তখন একটিমাত্র সমিতির পক্ষে সমস্ত শিল্পী ও শ্রমিকদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব

হয়ে ওঠে। তাই প্রতিটি শিল্পের জন্য গড়ে উঠল পৃথক পৃথক সমিতি। এগুলিকে বলা হত 'ক্র্যাফ্‌ট গিল্ড' বা শিল্পসংঘ। দু' প্রকারের সংঘই স্বয়ংশাসিত সংস্থা ছিল। বাইরের কারও হস্তক্ষেপ এরা পছন্দ করত না। সমিতিগুলির প্রধানরা অবশ্য শহরের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকত।

শিল্প-সংঘগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল শহরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার টিকিয়ে রাখা। বাইরের কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে শহরে ব্যবসা করা সম্ভব ছিল না। বিদেশী জিনিস আমদানি করাও যেত না। সংঘের সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য কোন শুল্ক দিতে হত না। সংঘগুলি জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কাজকর্মের নিয়ম স্থির করত। শিল্পীদের মজুরিও স্থির করে দিত। পণ্যদ্রব্যের মান যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং কারিগরি বা শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করাও শিল্প-সংঘের কাজ ছিল। এই শিক্ষা ছিল চার্চ-নিরপেক্ষ। ফলে বিদ্যালয় স্থাপিত হল। এখানে বেতন দিয়ে পড়তে হত। ছাত্রদের শপথ নিতে হত এই বলে যে শিল্পের গূঢ় কথা

মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পঠন পাঠন

অপরকে প্রকাশ করবে না। শিক্ষাকাণ্ড নির্ধারিত করে দেওয়া হত। এ সব স্কুল হতেই পরে মিউনিসিপ্যাল স্কুল গড়ে ওঠে। এ ছাড়া সংঘ বৃদ্ধ ও অশক্ত শ্রমিক এবং দুঃস্থ, বিধবা ও শিশুদের নানারকম সাহায্য করত।

প্রতিটি শিল্প-সংঘে তিন প্রকারের সদস্য থাকত—সর্দার-কারিগর, জার্নিম্যান বা দিনমজুর এবং শিক্ষানবিস। তবে প্রথম দুই প্রকারের সদস্যরাই সমিতি চালাত। পরে সর্দার-কারিগরদের হাতেই সমিতির পরিচালনার দায়িত্ব চলে যায়। শিক্ষানবিসী শেষ হলে কারিগররা 'জার্নিম্যান' হিসেবে গণ্য হত এবং পরে সর্দার-কারিগর হতে পারত। কেবল সর্দার-কারিগররাই শিক্ষানবিস রাখা বা জার্নিম্যানদের খাটাবার অধিকার পেত।

শহরে জীবনযাত্রা। মধ্যযুগের শহরগুলি জনবহুল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক শহরের মত এত বড় ছিল না। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং জনস্বাস্থ্যের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। এইসব শহরের রাস্তাগুলি খুব সরু আর নোংরা ছিল। নর্দমার সঙ্গে রাস্তার কোন পার্থক্য ছিল না। শহরে স্থানাভাব থাকায় রাস্তাগুলি সরু হত। বেশি বাড়ি তৈরি করার দিকেই নজর ছিল। নগর পরিকল্পনা বলে কিছু ছিল না। যেখানে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করা হত। সাধারণতঃ কুয়ো থেকেই শহরের জল সরবরাহ হত। বাজার, হাট, মেলা, দোকান প্রভৃতিতে শহর দিনের বেলায় সরগরম থাকত। রাত্রে রাস্তায় আলোর কোন ব্যবস্থাই ছিল না। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোর-ডাকাতরা প্রায়ই রাস্তায় উপদ্রব করত। মাঝে মাঝে অবশ্য দু' একজন পাহারাদার লম্বা লাঠির ডগায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে টহল দিত।

ত্রয়োদশ শতকে অবশ্য শহরের একটা সাধারণ রূপ আমাদের চোখে পড়ে। শহরের সবচেয়ে উঁচু জিনিসটি ছিল প্রধান চার্চের চূড়াটি। পরবর্তী প্রধান বাড়িটি ছিল টাউন হল এবং বিভিন্ন শিল্প-সমিতির বাড়িগুলি। শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকত প্রধান বাজার এবং বিভিন্ন দোকান। প্রথমদিকে এখানে কেবলমাত্র ব্যবসায়ীরাই আসত, পরে শিল্পী, কারিগর, তাঁতি, কামার, রুটিওয়ালা সকলেই বেচা-কেনার জন্য আসতে শুরু করে। পরে তারা শহরেই নিজ নিজ কর্মশালা স্থাপন করে। এইভাবে হস্তশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য একইসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিল।

শহরগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। শহরের জীবনযাত্রা ম্যানরের জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। স্বভাবতঃই শহরের শাসনকার্য চালাবার প্রয়োজন হল। শহরবাসীরা রাজা বা সামন্তদের নিকট হতে অর্থ দিয়ে সনদ নিল। এই সনদে তাদের নিজস্ব সরকার গড়ে তোলবার অধিকার দেওয়া হয়। তাছাড়া শহরগুলি যে সনদ পেল সেগুলিতে তাদের সামন্ত প্রথার দায়-দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। শহরগুলির শাসনব্যবস্থা একই প্রকারের ছিল না। তবে অধিকাংশ শহরের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করত একটি পরিষদ বা কাউন্সিল। মেয়র বার্গোমাষ্টার ছিলেন এই পরিষদের প্রধান।

মধ্যযুগের শহর
বার্গেন
স্টকহোলম
রিগা
মস্কো
নভগরদ
ডাবলিন
কোপেনহেগেন
লিউবেক
লণ্ডন
হামবুর্গ
ডানজিগ
ব্রিমেন
ব্রান্সউইক
ক্যালে
কোলন
লিপজিগ
ক্রাকো
কিয়েভ
প্যারিস
ভিয়েনা
জেনোয়া
ভেনিস
বুঁদাপেশ্ট
মার্শেই
ফ্লোরেন্স
বেলগ্রেড
কৃষ্ণ-সাগর
লিসবন
রোম
নেপলস
কাডিজ
ভূ-ম-ধ্য-সা-গ-র
টিউনিস
ত্রিপলি
আলেকজান্দ্রিয়া

সাধারণ নাগরিকদের ভোটাধিকার ছিল, কিন্তু শহরের প্রধান প্রধান পরিবারগুলির হাতে নগর শাসনের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব। শহরের জীবন কিন্তু একেবারে স্বাধীন ছিল না। কারণ শহরের নিজস্ব সমাজ গড়ে উঠেছিল। এই সমাজ অবশ্য ম্যানরের সমাজের মত কঠোর ছিল না। শহরের সমাজের শিরোমণি ছিলেন নামকরা ব্যবসায়ী, বণিক, ঋণদাতা এবং শিল্প-সমিতির প্রধানরা। এর পর যারা সমাজে গণ্যমান্য ছিলেন তাঁরা হলেন দক্ষ শিল্পী, কারিগর এবং কেরাণী। সমাজে যাদের বিশেষ স্থান ছিল না তারা হল বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শিক্ষানবিস ও অদক্ষ শ্রমিককুল। এই সমাজের প্রথম শ্রেণীই নগরের শাসনকার্য হতে শুরু করে সবক্ষেত্রে আধিপত্য করতেন। মধ্যযুগের শেষে এদের বলা হত 'বুর্জোয়া'। কথাটির অর্থ হল বুর্গের বা শহরের অধিবাসী। পরে অবশ্য এর অন্য অর্থ করা হয়েছে। বুর্জোয়ারা ইউরোপীয় সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করে যাকে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে থাকি। এই শ্রেণীই পরবর্তীকালে প্রতিটি দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা হস্তগত করে। এর জন্য অবশ্য তাদের দীর্ঘদিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল, কারণ তাদের অর্থকৌলিন্য থাকলেও জন্মকৌলিন্য ছিল না।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে সুদূর প্রাচ্য

মধ্যযুগে চীন

চীন একটি সুপ্রাচীন দেশ। চীনের ইতিহাসে মধ্যযুগ শুরু হয় সপ্তম শতকে। এই যুগ প্রায় সাতশ' বছর স্থায়ী হয়েছিল।

তাঙ বংশের শাসনকাল (৬১৮—৯০৭ খ্রীঃ)

তাঙ বংশের আগে চীনে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না বললেই হয়। তাঙ বংশী রাজারা চীনে কেবল শান্তি-শৃঙ্খলাই ফিরিয়ে আনেন নি, চীনের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। এই বংশ প্রায় তিন'শ বছর চীনে রাজত্ব করেছিল। চ্যাং-আন (সিগ্নান) ছিল তাঙ রাজাদের রাজধানী। এই বংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন তাইসুঙ (৬২৭—৬৪৯ খ্রীঃ)। তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি চীনকে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর, উত্তরে কিরঘিজ স্তেপ ও আলতাই পর্বত এবং দক্ষিণে আন্নম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঙ বংশের আর একজন পরাক্রান্ত সম্রাট হলেন মিঙ হুয়াঙ (৭১২—৭৫৬ খ্রীঃ)। তিনি একদিকে যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন অপরদিকে ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের সমজদার ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঙ বংশের পতন শুরু হয়।

তাঙ যুগে চীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি। চীনের ইতিহাসে তাঙ বংশের রাজত্বকালকে সুবর্ণ যুগ বলা হয়। এই বংশের রাজাদের চেষ্টায় চীনের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। পুনরায় ঐক্যবদ্ধ চীন সাম্রাজ্যে তাঙ রাজারা শাসনব্যবস্থা নতুনভাবে গড়ে তোলেন। সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিটি ত্রুটিহীন করার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। এর জন্য পূর্বেকার আইনকানুনে বিরাট পরিবর্তন আনা হয়। বিনা বেতনে বেগার খাটানো কমানো হয়। খাজনা ও কর আদায়ের পদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটানো হয়। নতুনভাবে কৃষি-জমি বিলি করার ব্যবস্থা হয়। অচিরেই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর সুফল দেখা গেল।

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সম্রাট ছিলেন মধ্যমণি। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি একটি পরিষদের পরামর্শ নিতেন। এ ছাড়া কয়েকটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা ছিল যেগুলি সরাসরি সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সমগ্র সাম্রাজ্য ১৫টি জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রতি জেলার প্রধানকে 'চৌ' বলা হত। সম্রাট এদের নিযুক্ত করতেন। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী নয়টি শ্রেণী ছিল। সরকারী বিভাগগুলি ঠিকমত কাজ করছে কিনা দেখবার জন্য একদল সদাজাগ্রত পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।

বাছাই-করা অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা তাঁদের সাহায্য করত। তাছাড়া নানা ব্যাপারে কৃষকদেরও সাহায্য তাঁরা পেতেন।

তাঙ যুগে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। প্রতিটি জেলায় স্কুলের সংখ্যা বাড়ান হয়। প্রতিটি স্কুলে কতজন ছাত্র পড়বে তাও সরকারী নির্দেশে বলে দেওয়া হত। পল্লী অঞ্চলের স্কুলেও ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। এ ছাড়া সাহিত্যের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এর নাম ছিল লুঙ্গ-ওয়েন-কুয়ান। লিপিশিক্ষা এবং আইন শিক্ষার জন্যও স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র পড়ত। একটি রাষ্ট্রীয় একাডেমীও স্থাপিত হয় ৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে গবেষণার কাজ হত।

চীনারা তাঙ যুগের আগেই কালি ও কাগজের ব্যবহার জানত। শিক্ষাক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল লিখিত পরীক্ষা প্রবর্তিত হবার ফলে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। কাঠ কুঁদে ব্লক তৈরী করে ছাপার কাজ চলত। চীনদেশকেই ছাপার আদি স্থান বলা হয়। এ যুগে ব্লকে ছাপানো কাগজের মুদ্রার প্রবর্তিত হয়।

তাঙ যুগে চীনাদের মধ্যে ব্যাপক সাহিত্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। এই যুগে আট খণ্ডে চীনের ইতিহাস লেখা হয়। তাঙ যুগে প্রায় দু'হাজার কবির উল্লেখ পাওয়া
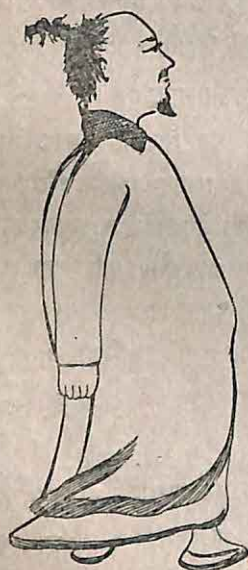
লি-পু তু-ফু

যায়। এ কারণে এই যুগকে কবির যুগ বলা হয়। কবিদের মধ্যে লি-পু এবং তু-ফু ছিলেন গীতি-কবিতায় দিকপাল। লি-পু-কে বলা হয় মর্তে দেবদূত। তাঁর কবিতায়

স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠেছে বলে এরূপ বলা হয়। এ যুগে চীনের সমাজে পণ্ডিদের খুব সমাদর ছিল। সমাজে যে চারিটি শ্রেণী ছিল সেগুলি হল যথাক্রমে পণ্ডিত, চাষী, কারিগর ও ব্যবসায়ী।

এই যুগে চীনা চিত্রশিল্পে এক নতুন ভাবের আমদানি হয়। চীনারা কাপড়ে কারুকার্যখচিত ছবি আঁকত এবং মন্দিরের প্রাচীর চিত্রিত করত। এ যুগের কাঠে, হাতির দাঁতের কাজে, কাঁচে এবং মূল্যবান পাথরের সূক্ষ্ম কাজগলি আজও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। পেতলের কাজেও তারা সিদ্ধহস্ত ছিল। এই যুগের মাটির পাত্রগুলি অলঙ্করণে এবং চাকচিক্যে খুবই সৌন্দর্যময় ছিল। উ-ইয়ু হলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

তাঙ যুগে চীনদেশে চা পানের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। এই যুগের বিভিন্ন কবি চা সম্বন্ধে বহু কবিতা লিখে গেছেন। আমরা 'চা' নামটি চীনদেশ হতে গ্রহণ করেছি।

চীনের ইতিহাসে তাঙ যুগ হল সমৃদ্ধির যুগ। এই সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অবদান যথেষ্ট ছিল। তাঙ রাজাদের চেষ্টায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। এই যুগে চীনারা সমুদ্রপথে চা, রেশম, মসলা, কাগজ প্রভৃতি নিয়ে দেশ বিদেশে ব্যবসা করতে যেত এবং বিদেশ হতে নানা পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসত। চীনে রৌপ্যমুদ্রা এই যুগে প্রচলিত হয়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে।

তাঙ যুগের শিল্প। কাঠের তৈরী বোধিসত্ত্ব

চীনে বৌদ্ধধর্ম। তাঙ যুগের বহু আগেই বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হয়। তাঙ যুগে এই ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই ধর্ম কেবলমাত্র চীন দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। চীন হতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। চীন ঠিক ভারতের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নি। চীনের বৌদ্ধমত সাধারণতঃ মহাযানী; কিন্তু হীনযানী মতবাদও যথেষ্ট

ছিল। মহাযানীরা বোধিসত্ত্বের আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন যে পরের মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা এবং সকলের দুঃখ মোচন করা তাঁদের জীবনের ব্রত। বুদ্ধদেবকে তাঁরা ঈশ্বর বলে মনে করেন। চীনের সাধারণ মানুষ এই ধর্মে শান্তি পেয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম কিন্তু চীন দেশের বিজ্ঞানচর্চাকে রুদ্ধ করে দেয় নি। চীনা দর্শন বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে।

তাঙ-যুগে চীনের সংস্কৃতি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। কোরিয়া, জাপান ও আন্নামের সঙ্গে চীনের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর ফলে চৈনিক চিন্তাধারা ও সভ্যতা এইসব দেশে প্রসারিত হয়। চীনের বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্য কোরিয়া, জাপান ও আন্নামের সংস্কৃতির ওপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে এই দেশগুলিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হতে চীনের অংশ বলে মনে হত।

হিউয়েন সাঙ-এর ভারত পরিভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন। ভারত ও চীনের সম্পর্ক ছিল অতি গভীর ও সুপ্রাচীন। তাঙ যুগে এই সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছিল। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ভারত চীনের কাছে এক তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক চীনে যেতেন। চীন থেকেও বহু জ্ঞানপিপাসু ভারতে আসতেন। তাঙ যুগের প্রথমদিকে হিউয়েন সাঙ ভারত পরিভ্রমণে বের হন। বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে দেখবার এবং সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করবার জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আসবার জন্য তাঁর আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে পথের কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলে গ্রাহ্য করেন নি। ভারতে আসার সময় সুবিস্তীর্ণ গোবি মরুভূমি পার হয়ে তিয়েনসিন পর্বতমালার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে ঈশিকুল হ্রদ, তাসখন্দ এবং সমরখন্দ হয়ে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন (৬২৯ খৃীঃ)। প্রায় তের বছর ধরে এ দেশের নানাস্থান ভ্রমণ

হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ-এর ভারতে আগমন
ও চীনে প্রত্যাবর্তনের পথ
গোবি মরুভূমি
চীনের প্রাচীর
ইশিকুল হ্রদ
তিয়েনশান পর্বতমালা
সমরখন্দ
পামীর
কাশগড়
কুয়েনলুন পর্বতমালা
সিংহ্যান যাত্রা শুরু
পেশোয়ার
সিন্ধু
উত্তর ভারত
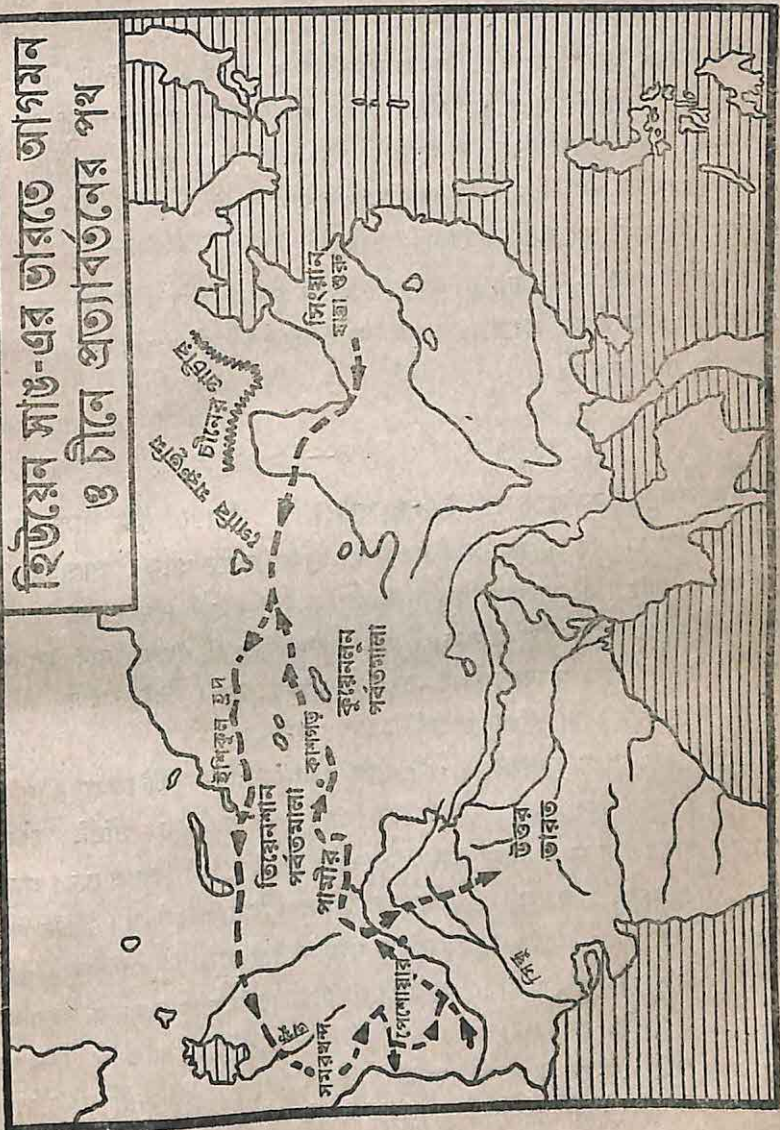
করে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। ফেরবার সময় দক্ষিণের পথ দিয়ে আফগানিস্তান হয়ে পামীর পেরিয়ে খাইবারে উপনীত হন। এর পর কুয়েনলুন পর্বত অতিক্রম করে ইয়ারখন্দ হয়ে চীনের প্রাচীর প্রান্তে পৌঁছান। যখন তিনি ভারত হতে চীনের রাজধানী সিয়েনফুতে প্রবেশ করেন তখন তাঁকে রাজোচিত সম্মান দেখান হয়। তিনি ভারত হতে যে-সব পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে যান তা বহন করতে কুড়িটি ঘোড়া লেগেছিল। বুদ্ধের ছোট-বড় বহু মূর্তিও তিনি চীনে নিয়ে যান। পরবর্তী কালে চীনের শিল্পীরা এইসব মূর্তির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করতে শুরু করেন। এইভাবে চীনের শিল্পে ভারতীয় প্রভাব পড়েছিল।

হিউয়েন সাঙ চীন সম্রাটের অনুরোধে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লেখেন এবং ভারতীয় পুঁথিগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ফলে এই দুই দেশের মধ্যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান-প্রদান সহজ হয়।

সুঙ যুগ (৯৬০—১২৭৯)

তাঙ রাজারা যুদ্ধবিগ্রহে সর্বদাই লিপ্ত থাকতেন। ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে:পড়ে এবং যাযাবর জাতিগুলি চীনের ওপরে হামলা করতে থাকে। আন্নাম স্বাধীন হয়ে যায়। শক্তিশালী সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় প্রধান হয়ে পড়ে। এই অবস্থার অবসান ঘটান চাও কুয়াঙ ইন বা সুঙ। তাঁর নামানুসারে এই বংশের নাম হয় সুঙ বংশ। তিন শ' বছর অধিককাল এই বংশ চীনে রাজত্ব করে। এই বংশের রাজারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার। এই যুগে সমগ্র দেশটিকে ২৩টি জেলায় ভাগ করা হয়। দুর্ভিক্ষের হাত হতে জনসাধারণকে রক্ষা করবার জন্য প্রতিটি জেলার শস্যাগার স্থাপন করা হয়। রাজা ওয়াং (১০২১—১০৮৬ খ্রীঃ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। পুরানোপন্থীরা এরা বিরোধিতা করে। তিনি কিন্তু এ কাজে এগিয়ে যান। তিনি নতুন আর্থিক সংস্থা স্থাপন করেন। এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল সরকারী ব্যয় কমানো। সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ নেওয়া বন্ধ করার জন্য তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের মূল্য যাতে না বৃদ্ধি পায় তার জন্য তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। সরকারী কর্মচারীদের বেতন অর্ধেক শস্যে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারী শস্যাগার হতে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র যাতে জনসাধারণ কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয় এবং চাষীদের নিকট হতে উচিত মূল্যে কৃষিপণ্য কেনবারও ব্যবস্থা রাখা হয়। গরীব চাষীদের মহাজনদের শোষণ হতে রক্ষা করবার জন্য অল্প সুদে

অর্থ বা শস্য ঋণ দেওয়া হত বসন্তকালে যখন কৃষকরা জমিতে ফসল লাগাবার কাজে ব্যস্ত থাকত এবং ফসল ওঠাবার সময় এই ঋণ কৃষকদের পরিশোধ করতে হত।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থা। গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত সরকারী একচেটিয়া ব্যবস্থা তিনি স্থাপন করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। শিল্পের সংশ্লিষ্ট শাখার সঙ্গে জড়িত শহরাঞ্চলের কারুশিল্পীরাও বণিক সংঘের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই সংঘগুলিকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সরকার কর্তৃক এগুলি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সম্রাটের এই সংস্কারমূলক কার্যাবলী কায়েমী স্বার্থে আঘাত হানে। তারা এর বিরোধিতা করে, কিন্তু সম্রাট নিজ আদর্শে অটল থাকেন। অনেক সরকারী কর্মচারী চাকুরিতে ইস্তফা দেয়। এর ফলে রাজা তাঁর কার্যক্রম বাস্তবে পরিণত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। দক্ষ কর্মচারীর অভাবে তাঁর অনেক ভাল নীতি ব্যর্থ হয়ে যায়।

অন্যান্য সংস্কার। রাজা ওয়াং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করবার জন্য দশ লক্ষ লোক নিয়ে এক আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। প্রায় সাত লক্ষ লোক সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত থাকত। তিনি সম্পত্তির ওপর কর বসিয়েই ক্ষান্ত হন নি, ধনীদের সরকারী কাজে যোগ দেওয়াও আবশ্যিক করেছিলেন। সে সময় অধিক বিত্তশালীদের অধিক কর দিতে হত। সম্রাটের মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং পূর্বেকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু লুই সুঙ (১১০১—১১২৫ খ্রীঃ) রাজা হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সংস্কার কার্যক্রম চালু করা হয়।

সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি। সুঙ যুগে শহরাঞ্চলের সম্প্রসারণ ও শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। যে কোন আয়তনের শহরই ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এ যুগে চীন বিশেষ উন্নতি করে। সম্রাট লুই সুঙ নিজে একজন চিত্রশিল্পী ও সুলেখক ছিলেন। তিনি একটি রাজকীয় একাদেমী স্থাপন করেন। সুঙ আমলে বহু শহর গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল এবং বহু প্রতিভাশালী শিল্পী খ্যাতি অর্জন করেন। ল্যান্ডস্কেপ পেণ্টিং-এর সুবর্ণ যুগ হল সুঙ শাসনকাল। টুঙ ইউয়ান, ফুয়ো সী, লি কুয়াঙ লিন, ও মি ফি প্রভৃতি চিত্রশিল্পীরা এ যুগকে সমৃদ্ধশালী করে গেছেন। এ যুগ সাহিত্যকর্মের জন্যও বিখ্যাত। রাজার নির্দেশ দুটি বিশ্বকোষ সংকলিত হয়। তাঙ যুগের ইতিহাস লেখা হয়। সু-মা-কুয়াং সুপ্রাচীনকাল হতে একাদশ শতক পর্যন্ত চীনের ইতিহাস রচনা করেন। তাঙ যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিরা ছিলেন অগ্রণী। সুঙ যুগে সে স্থান নেন প্রবন্ধকাররা।

সুঙ যুগে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়মবন্ধ ছিল। দেশের মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ছ'জন মন্ত্রী থাকতেন, তার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী একজন। ইনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন। বিস্ময়ের কথা প্রাচীনকালেই চীন বুঝেছিল যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অন্যতম কাজ হল শিক্ষাবিস্তার। কারণ শিক্ষার বিস্তার ঘটলেই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে।

ইউয়ান যুগ

(মোঙ্গলদের শাসনকাল)

মঙ্গোল জাতি ও সাম্রাজ্য। তের শতকের প্রথমদিকে মধ্য এশিয়াতে একটি শক্তি-শালী মঙ্গোল রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই রাষ্ট্রটি স্থাপন করেছিল মঙ্গোল জাতির নেতা চেঙ্গিস খান। মঙ্গোলদের আদি বাসভূমি ছিল চীনের তৃণভূমি অঞ্চলে। তারা ছিল যাযাবর ও পশুপালনকারী। প্রথমে মঙ্গোলরা ছিল দুর্বল ও পরাধীন। কিন্‌ নামে শক্তিশালী এক হূন জাতি তাদের ওপর কর্তৃত্ব করত। হূনদের হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য মঙ্গোলরা সংঘবদ্ধ হয়। মঙ্গোলদের মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি ছিল। এক একটি উপজাতির নেতাদের বলা হত খান বা সর্দার। খানদের অধীনে বহু সশস্ত্র অনুচর থাকত। এরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। তের শতকের প্রারম্ভে মঙ্গোল খানরা স্তেপভূমির মঙ্গোল নেতা তেমুজিনকে সমবেতভাবে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়। তেমুজিন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলদের নেতা বা মহান খান হিসেবে নির্বাচিত হন এবং চেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহণ করেন।

চেঙ্গিস খান

চেঙ্গিসের নেতৃত্বে মঙ্গোলরা দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস উত্তর চীনের পিকিং দখল করেন। উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করে তিনি মধ্য এশিয়ার কাশগড়, বোখারা ও সমরখন্দ জয় করেন। চেঙ্গিসের সাম্রাজ্য পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কুবলাই খান। চেঙ্গিস খান-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওদগাই খান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। এই সময় সমগ্র চীন মঙ্গোলদের অধিকারে আসে। ওদগাই খান হঠাৎ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর মঙ্গু খান মঙ্গোলদের নেতা হন। মঙ্গু তাঁর এক ভাই কুবলাই খানকে চীন দেশের প্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মঙ্গু খানের মৃত্যুর পর কুবলাই গোটা মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি মঙ্গোলদের প্রধান রাজধানী কারাকোরাম ত্যাগ করেন এবং চীনের পিকিং শহরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় থেকেই মঙ্গোল সাম্রাজ্য মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্বে কুবলাই খান আর পশ্চিমে হুলাগু রাজত্ব করতে থাকেন। কুবলাই-এর নেতৃত্বে এইভাবে চীনদেশে বিখ্যাত ইউয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠ হয়। এই রাজবংশ প্রায় একশ বছর ধরে চীন শাসন করেছিল।

কুবলাই খান

কুবলাই খান সুশাসক ছিলেন। চীনের লোকেরা তাঁকে ঘরের লোক বলে মনে করত। কুবলাই খান তার প্রজাদের আচার-ব্যবহারের পরিবর্তনের চেষ্টা করেন নি, বরঞ্চ তিনি নিজেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে তিব্বতের রাজা হিসাবে স্থাপন করেন। এই সন্ন্যাসী রাজাই হলেন তিব্বতের পরবর্তী কালের দলাই লামাদের উত্তরসাধক। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মকে লামাতান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। 'লামা' কথাটির অর্থ সন্ন্যাসী নয়, শ্রেষ্ঠ বা প্রধান।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ইটালীর পরিব্রাজক মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী থেকে সম্রাট কুবলাই খান ও তাঁর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। মার্কো পোলো দীর্ঘকাল কুবলাই খান-এর সাম্রাজ্যে বাস করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

মার্কো পোলো ছিলেন ইটালীর ভেনিস শহরের বাসিন্দা। পিতা নিকা লো পোলো ও পিতৃব্য মাফেও পোলোর সঙ্গে মার্কো পোলো যে সময় চীন যাত্রা করেন সে

সময় তাঁর বয়স ছিল সতের বা আঠারো বছর। স্থলপথে আর্মেনিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে চীনে পৌঁছাতে তাঁদের প্রায় সাড়ে তিন বছর সময় লেগেছিল। চীনে পৌঁছলে সম্রাট কুবলাই পোলোদের বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জানান। মার্কো পোলো খুব ভাল করে চীনাভাষা শেখেন। কুবলাই তাঁকে হ্যাংচাও শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মার্কো পোলো প্রায় ষোল বছর চীনদেশে ছিলেন। তিনি সম্রাটের নির্দেশে চীন ছাড়াও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। দেশে ফেরবার সময় জলপথে সুমাত্রা, ভারতবর্ষ ইত্যাদি ঘুরে পারস্যে পৌঁছান। সেখান থেকে তাঁরা দেশে ফেরেন। পরে তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লেখেন।

মার্কো পোলো

মার্কো পোলো লিখেছেন কুবলাই খান ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। তাঁর রাজদরবার দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকত। রাজধানী পিকিং-এর ন্যায় সুন্দর শহর সে যুগে ছিল কিনা সন্দেহ। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও উদ্যানে রাজধানী পরিপূর্ণ ছিল। রাজসভা ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। প্রতিদিন বহু জিনিসপত্র দরবারে উপঢৌকন হিসেবে আসত। মাঝে মাঝে বিরাট ভোজসভা অনুষ্ঠিত হত। এতে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক নিমন্ত্রিত হত।

মার্কো পোলো যে হ্যাংচাও শহরের শাসনকর্তা ছিলেন সেখানে দোকানপাট, পাথরের রাস্তা, চওড়া খাল, বহু সেতু, বড় বড় হাট-বাজার, শস্যের গোলা এবং সাধারণের জন্য শস্যাগার ছিল। সোনা রুপার কাজ করা কাপড় চীনদেশের ঐশ্বর্য ও শিল্পকলার মহিমা প্রচার করত। মার্কো পোলো কেবলমাত্র পিকিং ও হ্যাংচাও-এর কথাই লেখেন নি, সমগ্র চীন এবং অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও তিনি লিখে গেছেন। সমগ্র চীনই সমৃদ্ধশালী ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ফুলের বাগান, শস্যক্ষেত্র, আঙুরের ক্ষেত ছিল সর্বত্র। ছোট-বড় শহরগুলি মানুষের চলাফেরায় এবং কাজকর্মে মুখর থাকত। বহু বৌদ্ধ-বিহার নানাস্থানে গড়ে উঠেছিল। চীনারা পাথুরিয়া কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করত। তখনকার দিনে অন্য কোন দেশ এর ব্যবহার

জানত না। সে সময় চীনদেশে কাগজের টাকার প্রচলন ছিল। কোন বৎসর শস্যহানি ঘটলে প্রজাদের ভূমিকর দিতে হত না।

চীনে বহু ভারতীয় বসবাস করত। প্রধানতঃ তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ওখানে থাকত। জাপান, ব্রহ্মদেশ ও ভারত সম্বন্ধেও মার্কো পোলো অনেক কথা লিখে

কুবলাই খান-এর রাজদরবারে মার্কো পোলো

গেছেন। জাপান ও দক্ষিণ ভারতের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা তাঁর লেখা হতে জানা যায়।

মধ্যযুগে জাপান

সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। চীনের ইতিহাসে জাপানকে শত রাজ্যের দেশ বলা হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের শুরুতেই (ষষ্ঠ শতক) জাপানের বিভিন্ন রাজ্যকে একত্র করার প্রচেষ্টা চলে। জাপানের প্রথম সম্রাট জিম্মু চেন্নো। তাঁরই বংশ জাপানের সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হয়ে আসছেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের সংঘর্ষের কথা জানা যায়। কিন্তু কোরিয়াকে জব্দ করতে গিয়ে জাপান বৌদ্ধ-সংস্কৃতি নিজের দেশে নিয়ে এল। সপ্তম শতকে জাপানে চীন-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্লাবন দেখা গেল। এই সময় জাপানী সমাজে দাস, প্রভু, কর্মী সংঘ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কথা জানা যায়। তাঁরা সম্রাটের

সাহায্যে আসতেন। অবশ্য জাপানে দাসের সংখ্যা খুব কম ছিল। যারা স্বাধীন-ভাবে কাজ করতে পারত না তারা ছিল কর্মীসংঘের লোক। তাদের বৃত্তি ছিল বংশগত এবং তাদের কাজ ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণীদের পণ্য সরবরাহ করা। কর্মী সংঘ ছিল অনেকটা গিল্ডের মত।
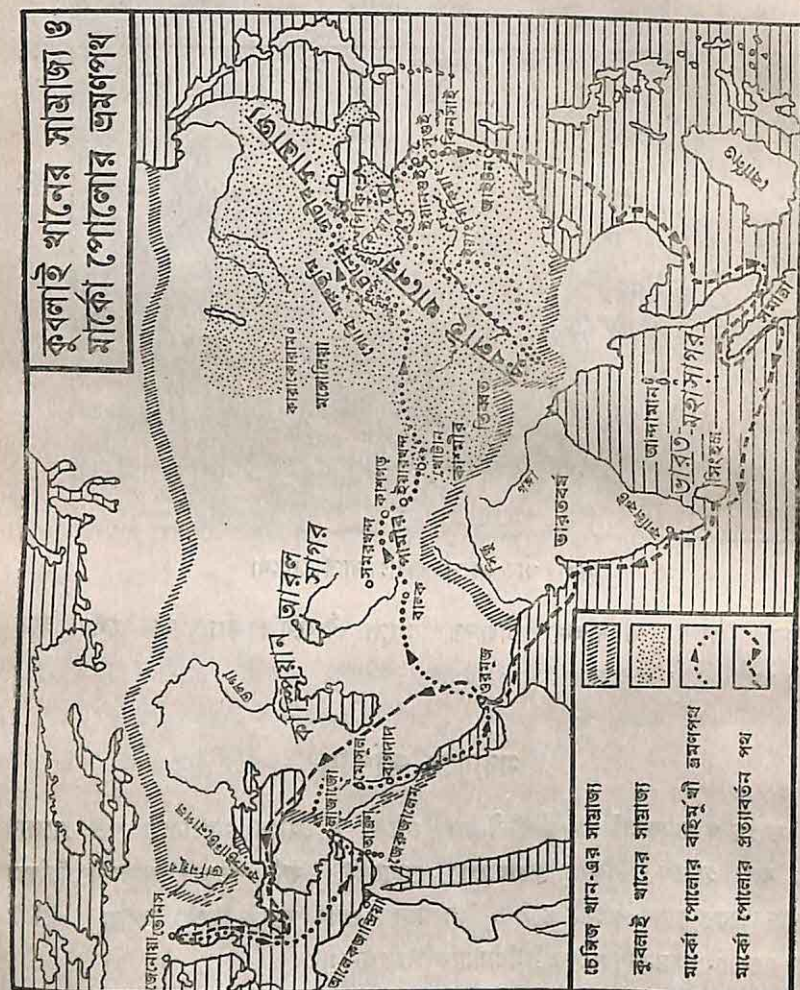
জাপানে সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। প্রতি পরিবারে কর্তা থাকতেন। এই কর্তা বংশগত ধারায় চলে আসত। তারা ছিল সম্রাটের অনুগত ব্যক্তি। সম্রাট তাঁর শাসনকার্য এঁদের মারফৎ চালাতেন। জাপানে শিণ্টো ধর্ম প্রচলিত ছিল।

আমাতেরাসু বা সূর্য-দেবীর পূজা সম্রাটের পরিবার হতে আসে এবং সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সম্রাটই শিণ্টো ধর্মের প্রধান হয়ে যান। জাপানী ভাষায় দেবতাকে বলা হয় 'কামি'। এই কথাটি অর্থ হল 'উঁচু'। মিকাডো বা সম্রাটের ক্ষেত্রেও 'কামি' কথাটির প্রয়োগ করা হয়। জাপানী সমাজে একক ব্যক্তি হিসেবে সম্রাট শ্রদ্ধা পেতে থাকেন। তাঁকে দেবতা মনে করা হত। মৃত সম্রাটদেরও দেবতার আসনে বসানো হত।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জাপানে মধ্যযুগের শুরু। এই শতকের শেষাশেষি একটি অনুশাসন রাষ্ট্রনায়ক শোটোকু সম্রাটের নামে ঘোষণা করেন। এতে বলা হল যে, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার আর মানা হবে না। সামর্থ্য আর যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হবে। বৌদ্ধধর্ম হবে সকলের ধর্ম। স্থানীয় নেতাদের আধিপত্য স্বীকার করা হবে না। উৎপীড়ন করে কর আদায় করা চলবে না। এই অনুশাসনের সঙ্গে চীনের তাঙ আমলের অনুশাসনের খুব মিল রয়েছে। এই অনুশাসন থেকে বোঝা যায় সমাজে আভিজাত্যের সূত্রপাত হচ্ছিল। এটি বন্ধ করবার জন্য শোটোকু ভূমি ও মানুষের ওপর একমাত্র অধিকার যে সম্রাটের সে কথাই ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসুবিধা দেখা গেল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার কেড়ে নেওয়াতে। দ্বিতীয় বিরোধ দেখা গেল সম্রাটের জমির ওপর একচেটিয়া অধিকার নিয়ে। তাই এ সংস্কার স্থায়ী হল না। শোটোকু চীনের তাঙ রাজাদের অনুসরণে যে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন তা বন্ধ করে দিলেন সম্রাট নাকামো ওয়ে (৬৪৫ খৃঃ)।

এর সঙ্গে সঙ্গে জাপানে তাইকো যুগ শুরু হল। এই সময় থেকে স্থানীয় নেতাদের অধিকার মেনে নেওয়া হল। ৭১০ খৃষ্টাব্দে নারা-তে রাজধানী তৈরি হ'ল। চীনের তাঙ রাজাদের অনুকরণেই এই রাজধানীর পরিকল্পনা। রাজধানী নারা-কে কেন্দ্র করে এক নতুন সভ্যতা শুরু হয়েছিল বলে একে বলা হয় নারা যুগ। নারা নগরী নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পূর্বেকার বিনিময় প্রথার বদলে চীনের অনুরূপ মুদ্রা প্রথা চালু হল। রাজকীয় হাট-বাজার স্থাপিত হল। চীনের অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হল। তাঙ যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতি জাপান বরণ করে নিল। জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা চীনে গিয়ে শিক্ষাদীক্ষা নিতে থাকলেন। অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির তৈরী হ'ল। জাপানের স্থাপত্য কার্যে, গৃহনির্মাণে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে চীনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চীনের ভাষা ও লিপি জাপান গ্রহণ করল। এই লিপি ব্যবহারে জাপানের সংস্কৃতি হয়ে উঠল প্রাণবন্ত। জাপানী কাব্য, সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করল।

হেইয়ান যুগ ঃ বংশানুক্রমিক জমিদার গোষ্ঠীর ক্ষমতা বৃদ্ধি। নারা যুগ হতেই

কিন্তু অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব। অষ্টম শতকের শেষভাগে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের পরাজয় ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক আমলাতন্ত্র ক্ষমতা লাভ করে। এই সময় প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত অভিজাতদের সঙ্গে প্রাদেশিক জমিদারদের বিরোধ বাধে। উভয় শ্রেণীই সম্রাটের ক্ষমতা কমাবার পক্ষে ছিল। তারা তাদের পদের সঙ্গে যুক্ত জমিদারিগুলিকে বংশানুক্রমিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়। ফলে সম্রাটের ক্ষমতা একেবারে কমে যায় এবং আসল ক্ষমতা হস্তগত করে ফুজিওয়ারা নামক জমিদার পরিবার। এই সময় হতে জাপানে শুরু হয় 'হেইয়ান যুগ'। বর্তমান কিয়াটোর অন্তর্গত হেইয়ান শহর এই সময় জাপানের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হেইয়ানই জাপানের রাজধানী ছিল। এর পর হতে টোকিও হয় জাপানের রাজধানী।

হেইয়ান যুগের (নবম, দশম ও একাদশ শতকের) প্রথমদিকে ফুজিওয়ারা বংশের লোকেরাই প্রধানমন্ত্রীর কাজের অধিকার পেত। স্বভাবতঃই এই বংশের ইচ্ছানুযায়ীই শাসন পদ্ধতি নির্ধারিত হতে লাগল। সমস্ত জমির মালিকানা খাস করে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে এনে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তা বানচাল হয়ে গেল। যাজক শ্রেণী এবং অভিজাতরা এইবার সমস্ত জমি দখল করল। এমন কি রাজস্বও তাদের হাতে চলে গেল। ভূস্বামীদের এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে 'শোয়েন' বলা হত।

শোগান শাসন। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের জমিদারদের মত শোয়েনের অধিকাংশ মালিক নিজ নিজ জমিদারিতে থাকতেন না। তাঁদের সম্পত্তি তদারক করত যারা তাদের বলা হত 'শোকন'। শোকন হতেই সামুরাইদের উদ্ভব ঘটে। সামুরাইদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পায় যে রাষ্ট্র বাধ্য হয়ে তার বহু ভূমি সামুরাইদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। ফলে সামুরাইদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রদেশগুলি হতে পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে।

এইভাবে জাপানে সামন্ত প্রথা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। কেন্দ্রীয় শক্তি খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি জাপানে তিনটি জমিদার গোষ্ঠী প্রবল হয়ে ওঠে। এগুলি হল উত্তরাঞ্চলে সামুরাই ও তাদের জমিদার প্রভু (মিনামোতো পরিবার), দক্ষিণাঞ্চলের বড় বড় জমিদাররা (তাইরো পরিবার) এবং ফুজিওয়ারা পরিবার। শেষোক্ত দলে সরকারী পদস্থ কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই-এ উত্তরাঞ্চলের মিনামোতো পরিবার জয়ী হয়। ইয়ারিতোমা মিনামোতো পরিবারের নেতা ছিলেন। তিনি নিজেকে জাপানের নতুন

শাসক 'শোগান' বলে ঘোষণা করলেন। তিনি সাগামি প্রদেশের কামাকুরাতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। সমগ্র দেশের শাসন-কর্তৃত্ব তাঁর হাতে এল। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে এটি ঘটেছিল। এই সময় হতে শোগান শাসন শুরু হল এবং প্রায় সাতশ' বছর ধরে এই শাসন জাপানে প্রচলিত ছিল। শোগানের ক্ষমতা কিয়াতোর সম্রাট অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল।

কামাকুরা যুগের সামন্ত যোদ্ধা

শোগানের ক্ষমতা কমাবার জন্য সম্রাট অভিযান চালালেন। ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে কামাকুরার শোগান আধিপত্য বিনষ্ট হলেও সামরিক শাসনের অবসান ঘটল না, কেবল শোগানের পরিবর্তন ঘটল। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাকাউজি শোগানের পদ অধিকার করলেন। কিন্তু জমিদাররা আবার প্রবল হল। এসব জমিদারদের বলা হত দাইমিয়ো। তাদের হাতেই প্রদেশের সেনাবিভাগ ও কর বিভাগ চলে গেল। দাইমিয়োরা নিজ নিজ এলাকায় শহর তৈরি করে কারিগরদের বসিয়ে নতুন যুগের সূচনা করল। ফলে দেখা দিল নানা সংঘ বা গিল্ড বণিক ও ব্যবসায়ী সংঘ একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করল ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে। দাইমিয়োরা এক একটি অঞ্চলে প্রধান হয়ে পড়ায় জাপান আবার যেন শত রাজ্যের দেশে পরিণত হল। এই অবস্থা হতে দেশকে রক্ষা করলেন হিদেয়যোশি নামে এক সামুরাই। তিনি নতুন শোগান হলেন। ক্ষমতা হস্তগত করেই তিনি সামুরাই ছাড়া অন্যান্যদের নিকট হতে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিলেন এবং সামুরাই ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে একটা ব্যবধান ঘটালেন। ঠিক হল এখন হতে কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা সামুরাই হতে পারবে না। বাণিজ্যিক সংঘের একচেটিয়া অধিকার দূর করা হল। জাপানে গোষ্ঠী বলতে রইলো সামুরাই গোষ্ঠী। জাপানী সমাজে শ্রেণীভেদ বিশেষভাবে দেখা দিল। এদের মধ্যে সামুরাই বা বুশীরা সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করল তারপর কৃষিজীবী, কারিগর ও বণিক।

সামুরাই। সংকল্পে অটুট ও উৎসর্গীকৃত সৈনিককে জাপানে বলা হত সামুরাই। এরা ছিল রণব্যবসায়ী। যুদ্ধ করাই এদের বৃত্তি। সমাজে এরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। সুবিধা ভোগই করবে না কেন? তারা কেবল সমাজে ফুলের মতোই নয়,

তারা শিকড়ও বটে। তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সমগ্র সমাজে সঞ্চারিত হয়েছিল। তরবারি ছিল তাদের ক্ষমতার আর শৌর্যের প্রতীক। পাঁচ বছর বয়সে শিশু সামুরাই পোষাক পরে সৈনিক শিক্ষা শুরু করত। তরবারি কোমরে ঝুলিয়ে তাকে শিক্ষা নিতে হত। তারপর দিন থেকে তাকে আর তরবারি ছাড়া বাড়ির বাইরে দেখা যেত না। পনের বছর বয়সে সে সাবালক হত। আর তখন থেকে এই তরবারির সাহায্যে তার দায়িত্ব আর মর্যাদাবোধ জাগ্রত হত। প্রত্যেক সামুরাই দুটি করে তরবারি বহন করত, একটি প্রভুভক্তি আর একটি মর্যাদার প্রতীক—ছোট আর বড়। স্বভাবতঃই জাপানে সামুরাই ও অন্যান্যদের মধ্যে ব্যবধান দেখা দিয়েছিল।

সামুরাই

মধ্যযুগে ইউরোপের নাইটদের সঙ্গে সামুরাইদের তুলনা করা যায়। নাইটদের শিক্ষাকে যেমন বলা হয় 'সিভ্যালরি', সামুরাইদের শিক্ষাকে বুশীদো বলা হত। তবে বুশীদো বলতে কেবল সাহসিকতার শিক্ষা বোঝায় না, বুশীদো হচ্ছে সামুরাইদের নীতি। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বসময়ে তাদের এই নীতি পালন করতে হত। এই নীতি লিখিত ছিল না, মুখে মুখে এই নীতি শিক্ষা করতে হত না, এ নীতি পালন করতে হত। যুগ যুগ ধরে সামুরাইদের মধ্যে এই নীতি প্রচলিত ছিল। ন্যায়বোধ, দুঃখ সুখে অবিচলিত থাকা, গুরুজনে ভক্তি ও মানুষকে ভালবাসা, আনুগত্যবোধ, কর্তব্যকর্মে অটল থাকা—এইগুলি ছিল এই নীতিগুলির মধ্যে প্রধান।

সামন্ত যুগে জাপানে যখন দুর্যোগ দেখা দিত তখন সামুরাইদের ওপরই লোক ভরসা করত। বুশীদো সাহসিকতার শিক্ষা, পরোপকারের শিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনের

শিক্ষা দিয়েছিল। ফলে সামুরাইদের মধ্যে যে অনমনীয় শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে তার কাছে স্পার্টান শৃঙ্খলাও হার মানত। এই শিক্ষায় বুদ্ধি, চরিত্র, সৎসাহস এবং আত্মসংযম প্রভৃতির ওপর জোর দেওয়া হত। বুশীদোর আত্মসংযম প্রকাশ পেয়েছে 'হারাকিরি' প্রথার মধ্যে দিয়ে। এটি হচ্ছে তলপেটে ছোট তরবারি বিঁধিয়ে বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে টেনে এনে মৃত্যুবরণ করা। মরবার সময় সামনে ঝুঁকে পড়তে হবে। মুখে চোখে বেদনার ছায়া থাকবে না। কোন দুঃখ বা ক্ষোভ থাকবে না। এই আত্মহত্যা হল আত্মসংযমেরই একটি দিক। কখনো প্রভুর সঙ্গে মতান্তর হলে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাত হারাকিরিতে। এর দ্বারা সে বোঝাতে চেষ্টা করত—"যদি আমি অপরাধ করে থাকি তবে আমার আত্মাকে তোমার সামনে টেনে এনে দেখাচ্ছি—তুমি দেখে নাও সত্য আমি দোষী কিনা।"
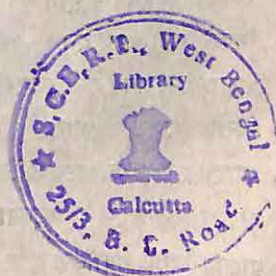
একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারত

গুপ্তোত্তর ভারত

ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে গুপ্ত সম্রাটরা সুদীর্ঘকাল ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রেখেছিলেন। তাঁরা ভারতীয় সভ্যতাকে একটি নতুন রূপদান করেন। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেতর ও বাইরের আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ল। এই বাইরের আঘাত আসে হূনদের নিকট হতে।

হূন আক্রমণ। চতুর্থ শতকেই হূনরা তাদের বাসস্থান মধ্য-এশিয়া হতে বের হয়ে বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। তাদের একদল ইউরোপে গিয়ে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। অপর দলটি (শ্বেত হূন) পারস্যের সাসানিয়া সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে গান্ধার অঞ্চলটি তারা দখল করে নেয়। গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের শাসনকালের শেষভাগে হূনরা ভারতের প্রান্তীয় প্রদেশ আক্রমণ করে। কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত ভারতের সীমান্তে হূন আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন হূনরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের কোন অংশই দখল করতে পারে নি।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর (৪৭৬ খৃঃ) দুর্বল গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে হূনরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ চালাতে থাকে। তাঁরা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলেন না। হূনরা উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হতে প্রবল আক্রমণ সুরু করে। পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ছিল তাদের রাজধানী। 'তোরমান' নামক নেতার নেতৃত্বে ষষ্ঠ শতকের শুরুতে তারা সমগ্র মালব দেশ অধিকার করে নেয়। সৌরাষ্ট্রের বল্লভী রাজ্যটিও তাদের হাতে চলে যায়।

তোরমানের মৃত্যুর পর মিহিরকুল হূনদের রাজা হন। গুপ্তরাজ নরসিংহগুপ্ত তাঁর নিকট পরাজিত হন। কিন্তু মান্দাসোরের রাজা যশোধর্মনের নিকট মিহিরকুলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এর পর মিহিরকুল কাশ্মীর দখল করে সেখানে নিজ স্বভাব-সুলভ অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করেন এবং বহু বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেন। এ কারণে তাঁকে 'ভারতের এটিলা' বলা হয়। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর হূনশক্তির ঐক্য-বদ্ধতা বিনষ্ট হয়। হূনরা এর পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজার নিকট পরাজিত হতে থাকে। তবে পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় একাদশ শতক পর্যন্ত ছোট ছোট হূন রাজ্য টিকে ছিল।

ভারতীয়দের সঙ্গে হূনদের যুদ্ধবিগ্রহ উভয়ের মধ্যে সম্পর্ককে তিক্ত করেছে। কিন্তু এই তিক্ততার মধ্যেও হূনগণ ভারতের ধর্ম গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ রাজপুতনায় ব্রোচ এবং

ভিনমল রাজ্য হূনদের একটি শাখা গুর্জরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সৌরাষ্ট্রের বল্লভীতে যে মৈত্রক বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাদের সঙ্গে হূনদের সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে এই হূনজাতি ভারতীয় জনসমষ্টির মধ্যে মিশে যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তি এবং রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব দেখা দেয়। সমগ্র ভারতে স্থাপিত হয় অনেকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য। এগুলির কোনটিরই সর্বভারতীয় রূপ ছিল না।

এই সময় মগধে শাসন করতে থাকেন গুপ্ত রাজাদের দুর্বল বংশধররা, বর্তমান আগ্রা এবং অযোধ্যায় ছিল মৌখরিদের রাজ্য। মালব রাজ্যের সঙ্গে ছিল মৌখরিদের শত্রুতা। থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ রাজত্ব করত। এ ছাড়া যে সব রাজ্য ও রাজবংশ সাময়িক প্রধান্য স্থাপন করে তাদের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের মৈত্রক বংশ, মালবের গুপ্ত বংশ, বাংলায় গৌড় রাজ্য এবং দক্ষিণে বাকাটক বংশই প্রধান।

হর্ষবর্ধনের যুগ

পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের সুপরিচালনায় থানেশ্বর রাজ্যটি অল্পদিনের মধ্যেই পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। থানেশ্বরের রাজ্যটি বর্তমান দিল্লীর নিকট অবস্থিত ছিল। তিনি কনৌজ রাজ মৌখরী বংশীয় গ্রহবর্মণের সঙ্গে নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন।

হর্ষবর্ধন

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর কিছুকাল পরেই কনৌজ-রাজ গ্রহবর্মণ মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্কের আক্রমণে নিহত হন এবং রাজ্যশ্রী শত্রুহস্তে বন্দিনী হন। এই সংবাদ পেয়ে রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু শশাঙ্কের হাতে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ফলে একই সময়ে কনৌজ ও

থানেশ্বর রাজ্য দুটির সিংহাসন শূন্য হয়ে পড়ে। হর্ষবর্ধন উভয় রাজ্যের অধিপতি হলেন। এইভাবে থানেশ্বর ও কনৌজের রাজ্য দুটি সংযুক্ত হবার ফলে উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন ঘটল। এই সংযুক্ত রাজ্যের রাজধানী হল কনৌজ।

সিংহাসনে বসেই হর্ষের প্রথম কাজ হল ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করা এবং গৌড়-রাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো। তিনি ভগ্নীকে উদ্ধার করলেন, শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে দু'বছর ধরে যুদ্ধ করেন। তবে শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি গৌড় দখল করতে পারেন নি। হর্ষের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস তাঁর সভাকবি বাণভট্টের লেখা 'হর্ষচরিত' গ্রন্থ হতে জানা যায়। এই গ্রন্থের বিবরণ হতে অনেকে মনে করেন যে হর্ষ নেপাল ও সিন্ধুদেশ জয় করেছিলেন। পশ্চিম ভারতের বলভিরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনকে তিনি পরাজিত করেন। তিনি গুর্জর রাজ্যের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য হর্ষের প্রাধান্য স্থাপিত হয় নি। নর্মদার তীরে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট তিনি পরাজিত হন। অবশ্য উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা হর্ষ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

হর্ষবর্ধন একজন জ্ঞানী, গুণবান এবং বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। রাজদরবারে বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাগম ছিল। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' গ্রন্থ দু'টির রচয়িতা মহাকবি বাণভট্ট এবং কবি ধাবক তাঁর সভাসদ ছিলেন। হর্ষ নিজেই ছিলেন সুলেখক। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনখানি নাটক লেখেন।

প্রথম জীবনে হর্ষ ছিলেন শৈব। কিন্তু পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। রাজধানী কনৌজে তিনি পাঁচ বৎসর অন্তর মহামোক্ষ পরিষদ নামে একটি ধর্মসভার আয়োজন করতেন। বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতেরা এতে উপস্থিত থাকতেন। এ ছাড়া ধর্মপ্রাণ হর্ষ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে একটি মহামেলা আহ্বান করতেন এবং সকল ধর্মের অনুরাগীদের দান করতেন। যে প্রান্তরে এটি অনুষ্ঠিত হত তাকে বলা হত সন্তোষক্ষেত্র। এই সময় তিনি বুদ্ধ, শিব ও সূর্যের উপাসনা করতেন।

চীনের তাঙ সাম্রাটদের সঙ্গে হর্ষের দূত বিনিময় হয়েছিল। হর্ষ ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঙ রাজসভায় একজন ব্রাহ্মণ দূত পাঠিয়েছিলেন।

অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের ধারণার বিলুপ্তি। হর্ষবর্ধনের শাসনকালে উত্তর ভারতে কিছুটা রাজনৈতিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর এক শিলালিপিতে তাঁকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটিও অতিরঞ্জিত। হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তর ভারতের সম্রাট ছিলেন না। হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে,

উত্তর ভারতের অনেক রাজ্যের ওপর তাঁর কোন প্রভাবই ছিল না। হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি হর্ষবর্ধনকে ছোট করেন নি। উত্তর ভারতের কাশ্মীর, পশ্চিম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা ও কামরূপ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে তাঁর সাম্রাজ্য বিহার, বাংলার কিছু অংশ, গঞ্জাম সমেত উড়িষ্যা এবং মথুরা বাদে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। আসমুদ্র হিমাচলের স্বপ্ন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা মৌর্য ও গুপ্ত রাজারা যেরূপ করেছিলেন, হর্ষবর্ধনের মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায় না। তিনি নিজের ক্ষমতার জন্য সামন্ত রাজাদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতেন।

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন। তিনি ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম দিক্ হতে ভারতে প্রবেশ করেন এবং কাশ্মীর হয়ে শিয়ালকোট ও জলন্ধর অতিক্রম করে কনৌজে উপস্থিত হন। তিনি প্রয়াগ, কাশী, বোধগয়া পরিদর্শন করেন। বঙ্গদেশ, আসাম, উড়িষ্যা ছাড়াও তিনি চালুক্য রাজধানী বাতাপি এবং পল্লব রাজধানী কাঞ্চী পরিদর্শন করেন। তিনি মালব, মুলতান ও সিন্ধুদেশও ভ্রমণ করেন।

হিউয়েন সাঙ চৌদ্দ বছর ভারতে ছিলেন। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি অধিকাংশ সময় হর্ষের রাজ্যেই অতিবাহিত করেন। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে ফিরে যান এবং তাঁর ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী হতে তৎকালীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু কিছু আমরা জানতে পারি।

হিউয়েন সাঙ তাঁর বিবরণীতে ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভারতবাসীরা ছিল সৎ ও সত্যবাদী। সরলভাবে তারা জীবনযাপন করত। ভারতীয়রা অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করত না। তারা আইন মেনে চলত। তারা খুবই অতিথিবৎসল ছিল। সমাজে অবশ্য জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পথঘাটও খুব নিরাপদ ছিল না। হিউয়েন সাঙ নিজেই কয়েকবার চোর ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে যাচ্ছিল। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পূর্ব ভারতে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের রাজ্য শাসনের প্রশংসা করেছেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যও তিনি ভ্রমণ করেন। তিনি ঐ রাজ্যের লোকেদের শৌর্যের প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশের বন্দর তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির কথা তাঁর লেখা হতে জানা যায়। কাশীর অসংখ্য মন্দির, উদ্যান ও জলাধার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেখানকার বিশ্বনাথের বিগ্রহ দর্শন করে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণপথ
হিন্দুকুশ পর্বত
কাশ্মীর
পুরুষপুর
তক্ষশীলা
বিতস্তা
চন্দ্রভাগা
ইরাবতী
মুলতান
শতদ্রু
থানেশ্বর
শ্রাবস্তী
কনৌজ
গুর্জর
প্রয়াগ
বারানসী
পাটলীপুত্র
গয়া
গৌড়
উজ্জয়িনী
সৌরাষ্ট্র
বল্লভী
ধার
নর্মদা
কলচুরি
তাম্রলিপ্ত
তাপ্তী
আরব সাগর
কল্যাণ
চালুক্য রাজ্য
কোঙ্গদ
কলিঙ্গ
বঙ্গোপসাগর
কৃষ্ণা
গঙ্গ
কাবেরী
কেরল
বড়
মাদুরা
পাণ্ড্য
ভারত মহাসাগর
সিংহল
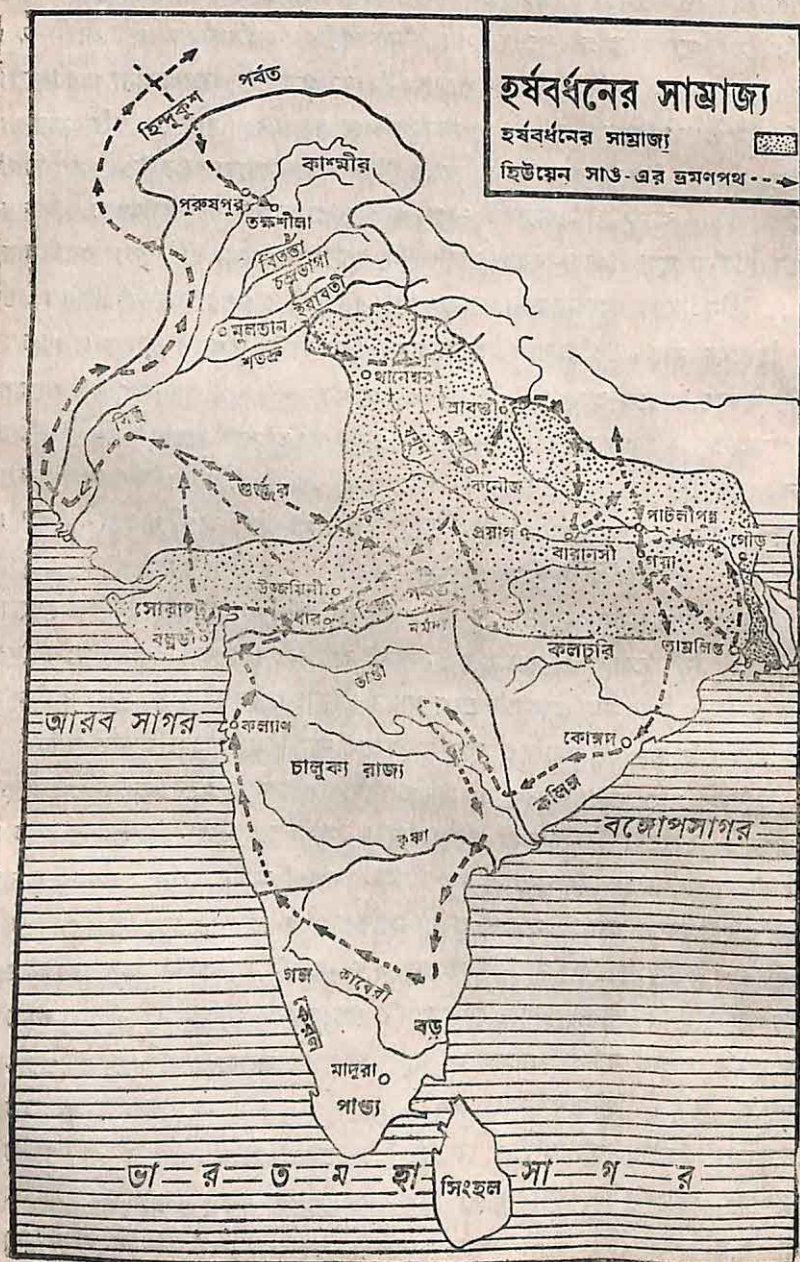
নালন্দা। পাটনা জেলায় বড়গাও গ্রামে প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এখানে তিনি পাঁচ বছর পড়াশুনা করেছিলেন। সে সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের মধ্যে বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সুদূর চীন, জাপান, কোরিয়া, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, জাভা, সুমাত্রা ও ব্রহ্মদেশ হতে শিক্ষার্থীরা এখানে অধ্যয়ন করবার জন্য আসতেন।

নালন্দার দ্রুত উন্নতির মূলে ছিল গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। হর্ষবর্ধনও নালন্দার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এক মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থব্যাপী এলাকায় বিস্তৃত ছিল। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শিক্ষাকেন্দ্রটিত আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে ৩০০ টি ছোট ঘরে ও সাতটি বড় হলঘরে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল।

ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে প্রায় দশ হাজার মানুষ নালন্দায় বাস করত। এখানে খনন করে ১৩টি ছাত্রাবাস পাওয়া গেছে। এগুলি সাধারণতঃ দোতলা ছিল। কক্ষমধ্যে পাথরের তৈরি খাট দেখে প্রতি ঘরে কজন করে ছাত্র থাকত তা বোঝা যায়। ঘর প্রতি
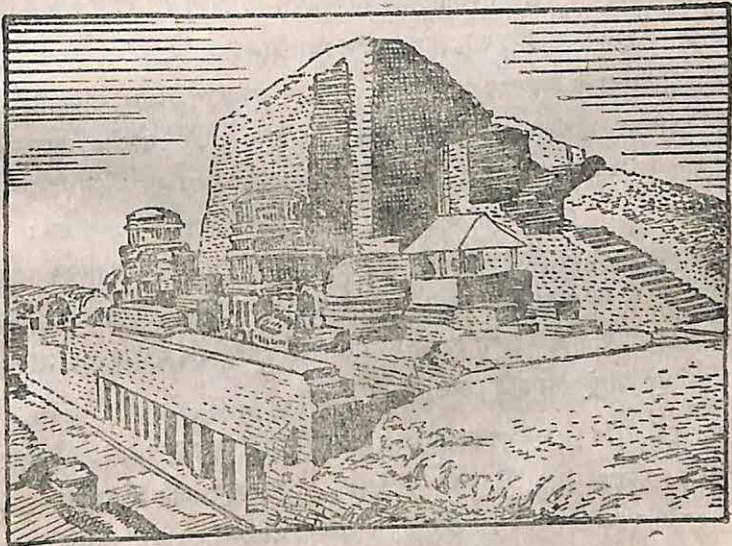
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

দু'জনের বেশি ছাত্র থাকত না। ঘরে বই ও আলো প্রভৃতি রাখাবার জন্য কুলুঙ্গি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিনামূল্যে ছাত্রদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন ১০০টি গ্রামের আয় থেকে নালন্দার সব খরচ চলত।

অধ্যাপকরা ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের ওপর নজর রাখতেন। নালন্দা ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। খুব মেধাবী না হলে এখানে ভর্তি হওয়া যেত না। নালন্দার খ্যাতির অন্যতম কারণ হল এখানকার বিরাট গ্রন্থাগার। রত্নসাগর, রত্নরক্ষক ও রত্নোদধি নামে তিনটি গ্রন্থাগার এখানে ছিল। সর্বোচ্চ রত্নোদধি ছিল নয়তলাবিশিষ্ট।

এখানে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, নক্ষত্রচর্চা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। নালন্দায় তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত।

নালন্দায় খ্যাতির আর একটি কারণ হ'ল এখানকার বিখ্যাত অধ্যাপকমণ্ডলী। হিউয়েন সাঙ-এর আমলে নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র নামে এক বাঙালী মহাপণ্ডিত। এ ছাড়া গুণমতি, চন্দপাল, স্থিরপাল, স্থিরমতি প্রভৃতি বিখ্যাত উপাধ্যায়ের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানকার অধ্যাপকরা নানা শাস্ত্রের বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

হর্ষোত্তর উত্তর ভারত

হর্ষের মৃত্যুর পর বহুদিন আর্যাবর্তে কোন বিখ্যাত রাজা বড় রাজ্য স্থাপন করতে পারেন নি। এই সময় উত্তর ভারত খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলা ও বিহারের পাল রাজ্য, আসামের কামরূপ রাজ্য, উড়িষ্যায় কলিঙ্গ রাজ্য, কনৌজের যশোবর্মনের রাজ্য এবং কাশ্মীরের কর্কট বংশীয় রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে যশোবর্মন নামে এক বীর যোদ্ধা কনৌজ অধিকার করেন। তিনি মগধ ও গৌড় রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করেন। তিনি অবশ্য কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের হাতে পরাজিত হন। ললিতাদিত্য থানেশ্বর জয় করেন। মালব ও গুজরাট তিনি নিজ অধিকারে আনেন, তিব্বতীদের পরাজিত করেন এবং গৌড়-রাজকে হত্যা করেন। ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাঁর রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে।

রাজপুত জাতি। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরবর্তী কালকে অনেকে 'পরিবর্তনের যুগ' বলেছেন। তাঁদের মতে এই সময় হতে শুরু করে মুসলমান বিজয়ের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ অষ্টম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত যে যুগ তাকে ভারতের ইতিহাসে 'রাজপুত যুগ' বলা যায়। এই সময়ে যে সব রাজবংশকে উত্তর ভারতে আধিপত্য করতে দেখা যায় তারা 'রাজপুত' নামক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজপুতদের উদ্ভব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা একমত নন। কারও কারও মতে রাজপুতরা আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা প্রাচীন সূর্য এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের

বংশধর। কারও মতে রাজপুতরা হ'ল শক, কুষাণ, হূন, গুর্জর প্রভৃতি যে সব জাতি ভারতে এসেছিল তাদের বংশধর। এই মতটি কিছুটা গ্রহণযোগ্য এ কারণে যে এই যুগের কোন কোন শিলালিপিতে রাজপুত প্রতিহার বংশকে গুর্জর নামক হূন জাতির বংশরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও দৈহিক গঠনের দিক হতে বর্তমান রাজপুত জাতিগুলিকে আর্যশ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা যায়, কিন্তু এরূপ গঠন পরবর্তীকালে আর্যজাতির সঙ্গে রক্তের মিশ্রণের ফলে সম্ভব হয়েছিল।

রাজপুতদের মধ্যে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী ছিল। প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেকে অপরগুলির চেয়ে সম্ভ্রান্ত বলে মনে করত। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অভিজাত সামরিক সম্প্রদায় ছিল। তারাই ভূমির মালিক হয়ে দাঁড়ায়। তারা তাদের অনুচরদের নিয়ে ভূমির ওপর কৃষকদের যেটুকু অধিকার ছিল তা কেড়ে নেয় এবং কৃষকদের বেগার দিতে বাধ্য করে। নিজেদের সেবাকর্মে তাদের নিযুক্ত করতেও সমর্থ হয়। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার জন্য সামন্ত শাসকরা পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করে।

উত্তর ভারতে রাজপুত জাতির অভ্যুদয় ঘটে গুর্জর প্রতিহারদের নেতৃত্বে। সপ্তম শতকে রাজপুতনার মান্দোরে এদের উত্থান হয়েছিল। পরে তারা মালবে রাজ্য স্থাপন করে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অষ্টম শতকের প্রথমভাগে প্রতিহার রাজ প্রথম নাগভট্ট সিন্ধুদেশের আরব শাসককে পরাজিত করে প্রভূত সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন। এর ফলে গুর্জর প্রতিহার বংশের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ত্রিশক্তি সংগ্রাম। এই সময়ে ভারতে গুর্জর প্রতিহার ছাড়া আরও দুটি রাজশক্তি পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই শক্তি দুটি হল বাংলার পাল শক্তি এবং মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূট শক্তি। পালরাজারা কনৌজ অধিকার করবার জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই যুগে কনৌজের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে এই নগরটি অধিকার সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্যের সমতুল্য বলে মনে করা হত। প্রতিহাররা অবশ্য বহুদিন কনৌজে শাসন করেছিলেন।

পাল, রাষ্ট্রকূট এবং প্রতিহারদের ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামে তিনপক্ষই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই তিনটি শক্তির মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল অপর দুটি শক্তিকে বিপর্যস্ত করা। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ক্ষমতা কারও ছিল না। স্বভাবতই এই তিনটি শক্তির ভাগ্য বিপর্যয়ের সুযোগে বিভিন্ন সামন্ত রাজারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এইসব রাজ্যগুলি নিজেদের ঘরোয়া বিবাদেই লিপ্ত থাকে।

বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠী। উত্তর ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে যে সব রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে দিল্লী আজমীরের চৌহান বংশ, গুজরাটের

চৌলুক্য বংশ, মালবের পরমার বংশ, কনৌজের গাহড়বাল বংশ, মেবারের গুহিলোট বংশ, বুন্দেলখন্ডের চন্দেল্ল বংশ এবং জব্বলপুর অঞ্চলে চেদি বা কলচুরি বংশ প্রধান। এই বংশের রাজারা রাজপুত ছিলেন এবং এরা সকলেই ছিলেন প্রতিহারদের সামন্ত। প্রতিহার রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে এঁরা বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেন। এই রাজ্যগুলি ছাড়া উত্তর ভারতে আর যে কয়টি রাজ্য ছিল সেগুলির মধ্যে বিহারের পাল বংশ, বাংলার সেন বংশ, কামরূপের পাল বংশ এবং উড়িষ্যার প্রাচ্যগঙ্গ বংশ প্রধান। এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। দেশের সামগ্রিক স্বার্থের অপেক্ষা আপন রাজ্য ও বংশের গৌরব বৃদ্ধিই এই সময়ের রাজাদের কাম্য ছিল।

শশাঙ্ক। প্রাচীন বাঙলার প্রামাণ্য ইতিহাস গুপ্তযুগ হতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের শাসনকালে গোটা বাংলাদেশ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশ তিনটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। তবে গৌড় রাজ্যের রাজা শশাঙ্কই হলেন প্রথম স্বাধীন বাঙালী নরপতি।

শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী হতে তাঁর রাজ্যবিস্তারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষান্ত হন নি। তিনি দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে মগধ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। এইভাবে তিনি এক বিরাট রাজ্য গড়ে তোলেন। থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে প্রাণ হারান। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি স্বাধীন নরপতি হিসেবেই গৌড় রাজ্য শাসন করেছিলেন।

বাংলাদেশে পাল বংশের রাজত্ব। শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে ঘোরতর অরাজকতা দেখা দেয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ হতে বাংলার একশ' বছরের ইতিহাস বড়ই অস্পষ্ট। এই অরাজকতা ও বিশৃংখলার যুগকে 'মাৎস্যন্যায়ের যুগ' বলা হয়। এই অসহনীয় অবস্থার অবসানকল্পে বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এক মহাসভায় মিলিত হয়ে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে তাদের রাজা নির্বাচিত করেন। গোপাল যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের ইতিহাসে তা 'পাল বংশ' নামে খ্যাত। এই পাল বংশের আমলেই বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পাল রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যের স্তরে উন্নীত করেন তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করেন এবং সাময়িকভাবে কনৌজ অধিকার করেন। পরে তিনি চক্রায়ুধ নামে একজন অনুগত

ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কথিত আছে, কনৌজের এক ধর্মমহা-সম্মেলনে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি দেশের রাজারা ধর্মপালকে রাজাধিরাজ বলে স্বীকার করেন।
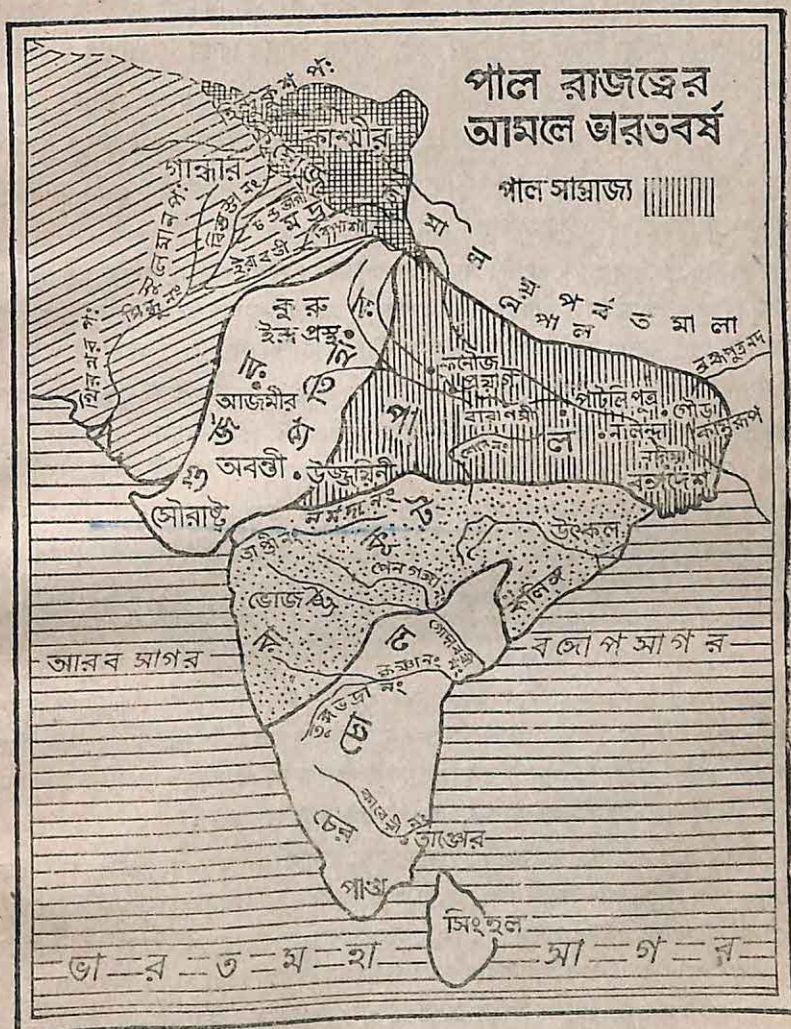
ধর্মপালের পুত্র দেবপালের আমলে পাল বংশের গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন প্রাচীন লিপি হতে জানা যায় যে তিনি কামরূপ, উড়িষ্যা, গুর্জর প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁর সময় পাল সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও গৌরবের শীর্ষে উপনীত হয়। তিনি সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি রাষ্ট্রের রাজাদের সঙ্গে

কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেন বংশের রাজত্ব। বিজয়সেন এই বংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন। বিজয়সেনের পর বল্লালসেন রাজা হন। কথিত আছে তিনি মগধ ও মিথিলা জয় করেছিলেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষণসেন হলেন এই বংশের শেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতি। শিলালিপি হতে জানা যায় তিনি কামরূপ ও কলিঙ্গ দেশ জয় করেন এবং পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানী ছিল নদীয়া। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির অতর্কিত আক্রমণে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করেন এবং পূর্ব বাঙলায় চলে যান।

পাল ও সেন যুগে বাঙালীর সামাজিক জীবন। পাল ও সেন বংশ বাংলায় পাঁচশ' বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই পাঁচশ' বছরের ইতিহাস বাঙালী জীবনে বহু পরিবর্তন নিয়ে আসে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত তার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

পাল ও সেন যুগের সাহিত্য গ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে সে যুগের বাঙালীরা সহজ ও সরল জীবনে অভ্যস্ত ছিল। পালযুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল না, কিন্তু সেনযুগে এই প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। বল্লাল সেন বাঙালী সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন সমাজে জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখবার জন্য। এই যুগে বাংলায় বহুরকমের জাতি ছিল। জাতি বলতে তখন বৃত্তি বোমাক। জাতিচ্যুত হলে লোকে দেশান্তরে গিয়ে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করে অন্য জাতিভুক্ত হতে পারত। সমাজে এই সময়ে নারীজাতিয় সম্মানজনক স্থান ছিল।

সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী ও জয়দেব প্রমুখ লেখকদের রচনা এবং সেকালের মূর্তি, ছবি প্রভৃতি হতে পাল ও সেন যুগের বাঙালীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। লাঙল-কাঁধে চাষী, তীর-ধনুক হাতে পুরুষ, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র-বাদনরতা নারীর দল, নৃত্যরতা নারী প্রভৃতি সেকালের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নানা নিদর্শনের মধ্যে সে যুগের বাঙালীদের জীবনযাত্রার পরিচয় মেলে।

পাল ও সেন যুগের বাঙালীরা ছিল ভোজনবিলাসী। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, দুধ ও দুধের তৈরী নানারকম জিনিস। গাওয়া ঘি দিয়ে সফেন গরম ভাতের বর্ণনা পাওয়া যায় 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গ্রন্থে। এ যুগের ভাস্কর্যে আর চিত্রে কদলীভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র দেখা যায়। হেমন্তে নলেন গুড়ের গন্ধে ভরপুর গ্রামের বর্ণনা রয়েছে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে।

আজকের মতো ধুতি-শাড়িই ছিল তখনকার বাঙালীর প্রধান পোশাক। পুরুষেরা খাটো ধুতি মালকোচা দিয়ে পরত; তা হাঁটুর নীচে নামত না। বিশেষ উৎসবে পুরুষেরা গায়ে চাদর ব্যবহার করত। চামড়ার জুতো ও কাঠের খড়ম—দু' রকম পাদুকা তারা ব্যবহার করত। লাঠি ও ছাতার প্রচলন ছিল। মেয়ে-পুরুষ উভয়েই

গয়না পরত। পুরুষেরা মাথায় রাখত বাবরি চুল। নানারকম খোঁপা বাঁধত মেয়েরা। বিবাহিত মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর ধারণ করত। শাঁখা পরতে তারা ভালবাসত।

দাবাখেলা, পাশা-খেলা, ঘুঁটি-খেলা, বাঘবন্দী, দশ-পঁচিশ প্রভৃতি খেলা প্রাচীন বাঙালী স্ত্রী-পুরুষের প্রিয় ছিল। নাচ-গান, যাত্রা অভিনয়ের খুব প্রচলন ছিল। করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল। গরুর গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, নৌকা, পাল্কী প্রভৃতি ছিল তখনকার দিনের যাতায়াতের মাধ্যম।

ধর্ম। পালরাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের আগ্রহে বাংলা ও বাহির অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। অবশ্য এই যুগে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার প্রভাব দেখা দেয় এবং মুদ্রা, মণ্ডল, ক্রিয়াকাণ্ড, ব্রত, নিয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়। পালরাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুগামী হলেও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম নিয়ে তেমন বিরোধ ছিল না। সেনযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় শৈব ও বৈষ্ণব দুই ধর্মীয় মতবাদই প্রবল হয়ে ওঠে। সেনযুগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগের রাধা-কৃষ্ণলীলা বাংলা হতে ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে কীর্তন সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়। এই ধর্মীয় সঙ্গীত বাংলার একটি নিজস্ব সম্পদ।

শিক্ষার প্রসার। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছিল। পালরাজারা সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পালযুগেই বাংলা বর্ণমালার আভাস ফুটে ওঠে। সেন যুগে এই বর্ণমালা পূর্ণতার দিকে আরও অগ্রসর হয়।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শিক্ষা বিস্তারের দিক হতে পালযুগের গুরুত্ব অপরিসীম। পাল-রাজাদের আমলে ওদন্তপুর, সোমপুর, পাহাড়পুর ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওদন্তপুর শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। এটি নালন্দার নিকট অবস্থিত ছিল। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। এর গ্রন্থাগার খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। মেধাবী ছাত্ররা এখানে বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভ করতে পারত। বিখ্যাত পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন ওদন্তপুরের ছাত্র। বিক্রমশীলা

এ যুগের আর একটি শিক্ষাকেন্দ্র। ধর্মপাল এই শিক্ষাকেন্দ্রটি স্থাপন করেন। বর্তমান বিহার রাজ্যের ভাগলপুর জেলায় এটি অবস্থিত ছিল। তিব্বত ও নেপালের ছাত্ররাই এখানে বেশি সংখ্যায় পড়াশুনা করতে আসত। শিক্ষার ক্ষেত্রে এখানে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্র দুটিই এখানে পড়ান হত।

দক্ষিণ ভারত

গুপ্তোত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে আমরা ইতিপূর্বে যা আলোচনা করেছি প্রকারান্তরে তা উত্তর ভারতের। এর কারণ দক্ষিণ ভারতের প্রথমদিকের ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ হতে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস বেশ স্পষ্ট। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে বেশ কয়টি শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব ঘটে, যে রাজবংশগুলি উত্তর ভারতে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে চালুক্য, পল্লব এবং চোল রাজ্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত।

চালুক্য বংশ। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি প্রথম পুলকেশী চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বাতাপী বা বাদামী নগর (মহারাষ্ট্রের নাসিকের নিকট)। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। তিনি ৬০৯ হইতে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি গুজরাট, মালব, কোঙ্কণ প্রদেশ নিজ অধিকারে আনেন। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজাদেরও তিনি পরাজিত করেছিলেন। হর্ষবর্ধনও দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। এই পরাজয়ের ফলেই হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য জয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্য সম্রাটের সহিত দূত বিনিময় করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন এবং তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্ব ও গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিখ্যাত রাজা শেষ জীবনে পল্লব বংশীয় রাজার নিকট পরাজিত ও নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর বাদামীর চালুক্য বংশ সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য এই বংশের মর্যাদা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি পল্লব, চোল, পাণ্ড্য এবং মালাবারের রাজাদের পরাজিত করেন। সিন্ধুর আরবরা গুজরাট আক্রমণ করলে তিনি তাদের পরাজিত করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাদামীর চালুক্য বংশের পতন ঘটে। তবে দাক্ষিণাত্যের বেঙ্গি ও কল্যাণে বাদামীর চালুক্য বংশীয় রাজারা প্রায় আরও চারশ' বছর রাজত্ব করেছিলেন।

অসংখ্য শিল্পকীর্তির জন্য চালুক্য রাজারা ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিরাট বিরাট মন্দির নির্মিত হয়।

তাঁদের সময়েই শুরু হয় পর্বতগাত্র খোদাই করে গুহামন্দির নির্মাণের কাজ। ভারতের শিল্পতীর্থ অজন্তার বহু বিখ্যাত প্রাচীরচিত্র অংকিত হয় চালুক্যদের শাসনকালে।

অজন্তা চিত্রশিল্প। বোধিসত্ব

পল্লব বংশ। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নগরীকে কেন্দ্র করে পল্লবরা এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে পল্লবরা ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হতে থাকেন। রাজা মহেন্দ্রবর্মণ একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময়েই শুরু হয় পল্লব ও বাদামীর চালুক্যদের বংশানুক্রমিক সংগ্রাম। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট মহেন্দ্রবর্মণ পরাজিত হন। মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মণ ছিলেন পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করে পিতৃপরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি বাহুবলে দক্ষিণে চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল রাজ্য এবং সিংহলের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজ্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি এই রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। নরসিংহবর্মণের মৃত্যুর পর হতেই পল্লবদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে এবং চোল শক্তি পল্লব শাসনের অবসান ঘটায়।

পল্লব রাজারা প্রায় সকলেই শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁদের আমলে স্থাপত্য শিল্প নতুন রূপ নেয়। রাজধানী কাঞ্চীপুরমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পল্লবদের ভাস্কর্য,

শিল্প, স্থাপত্য, রেখাচিত্র ও রঙিন দেয়ালচিত্র। রাজধানী কাঞ্চী ছিল চিত্রকলার কেন্দ্রস্থল। এখানেই নির্মিত হয় বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির।
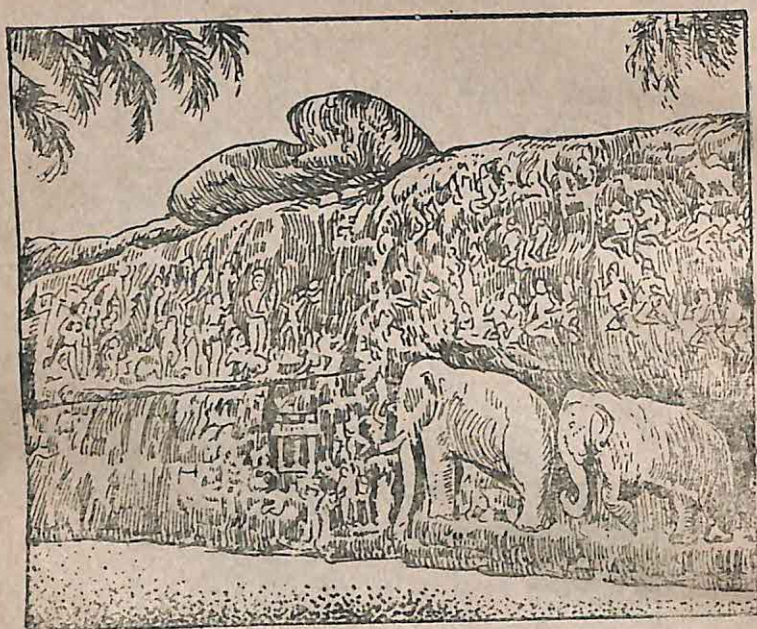
পাথর খোদাই-করা মন্দির। মহাবলীপুরম

পল্লব রাজাদের দ্বিতীয় কীর্তিপীঠ মহাবলীপুরম। এখানে পল্লব শিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। পাহাড় কেটে এখানেই কয়েকটি মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। সেই মন্দিরগুলি পঞ্চরথ নামে পরিচিত। প্রস্তরগাত্রে খোদিত দৃশ্য গঙ্গাবতরণ কেবল যে পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা নয়, সমস্ত শিল্পজগতে এর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

চোল বংশ। চোলরা খুব প্রাচীন জাতি। অশোকের আমলেও ওরা স্বাধীন ছিল। তবে নবম শতক থেকে চোলরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। সম্রাট রাজরাজ চোলের রাজত্বকাল থেকে চোলরাজাদের গৌরবের সময় সূচিত হয়। তিনি কলিঙ্গ, শ্রীলঙ্কার উত্তরভাগ, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান অন্ধ্র ও মাদ্রাজ রাজ্য দুটি, মহীশূর, কুর্গ প্রভৃতি অঞ্চল। তাঁর একটি শক্তিশালী নৌবহরও ছিল। তিনি ছিলেন চোল নৌ-শক্তির প্রতিষ্ঠাতা।

চোল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন রাজেন্দ্র চোল। তিনি চালুক্যরাজ এবং বাংলা ও বিহারের পাল বংশীয় রাজাদের পরাজিত করেন। গঙ্গার তটভূমি পর্যন্ত তাঁর বিজয় অভিযান চিরস্মরণীয় করবার জন্য তিনি 'গঙ্গইকোণ্ড' উপাধি গ্রহণ করেন এবং ত্রিচিনপল্লীতে 'গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম' নামে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। পিতার

ন্যায় তিনি দুর্ধর্ষ নৌবাহিনীর সাহায্যে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে পেগু এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করেন। ভারতের অন্য কোন রাজা সমুদ্রপথে এতদূর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন নি। চোল বংশের শেষ প্রসিদ্ধ রাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ। তাঁর মৃত্যুর পর চোল রাজ্য ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ভারতের ইতিহাসে চোল রাজত্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। চোল রাজারাই সর্বপ্রথম নৌ-বহর গঠনের সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। এই নৌ-শক্তির সাহায্যে তাঁরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা ও শ্রীবিজয় ইত্যাদি দেশগুলিতে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।

চোলরাজারা শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরের
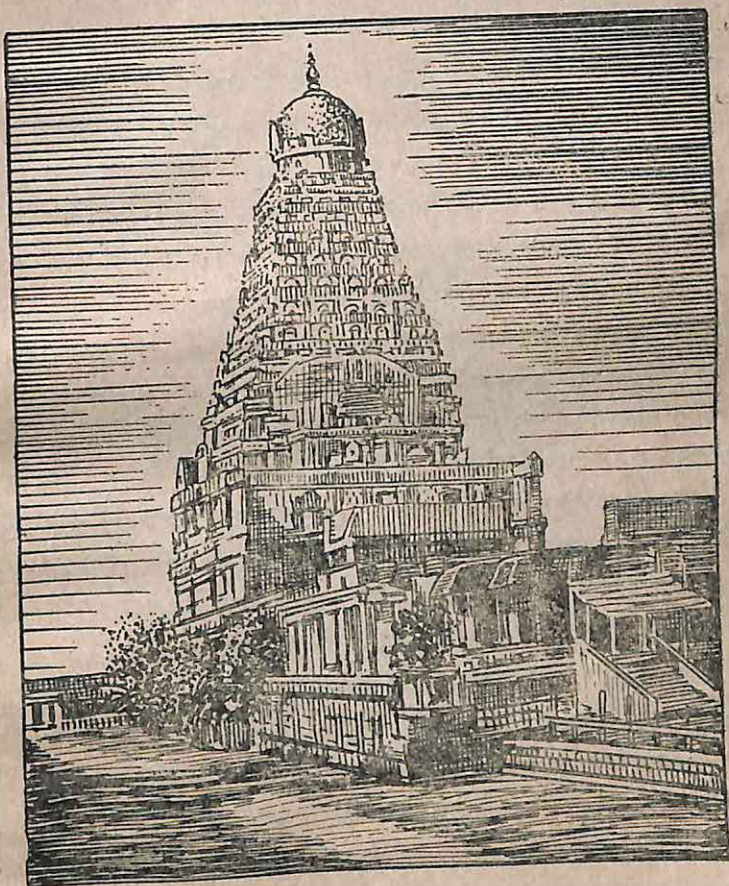
রাজরাজেশ্বরের মন্দির। তাঞ্জোর

মন্দির চোলযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। এই মন্দিরটি চৌদ্দতলাবিশিষ্ট এবং উচ্চতায় ১৯০ ফুট। অমরাবতীর স্তূপও চোল আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প গৌরব।

দ্বাদশ অধ্যায়

বহির্বিশ্বে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

অতি প্রাচীনকাল হতে স্থলপথে ও জলপথে ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ভারতবাসী স্থলপথে উত্তরে খোটান, কুচা, খাসগড়, চীন ও মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে পণ্য আদান প্রদান করত। হিন্দুধর্মও মধ্যে এশিয়ায় প্রসারিত হয়েছিল। পরে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ এই অঞ্চলের জনসাধারণ গ্রহণ করেছিল। খোটান রাজ্যের রাজা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

মহাযান মতবাদ। বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ মধ্য এশিয়া, চীন. তিব্বত, কোরিয়া, জাপান. প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে দুটি মতবাদ প্রচলিত ছিল—হীনযান ও মহাযান। হীনযান মতবাদে সমাজ পরিবার প্রভৃতি ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যানের দ্বারা নিজের মুক্তি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই মত স্বভাবতই সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে নি। সাধারণ মানুষ এমন একটি ধর্মমত চায় যা কঠোর নয়, যার মধ্যে করুণাময় ঈশ্বর আছেন। মহাযান ধর্মমতে এ সবই তারা পেয়েছিল। মহাযানীদের প্রচারিত ধর্মে বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের অবতাররূপে উপস্থিত করা হয়। তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেবার জন্য।

মধ্য এশিয়ায় পূর্ব তুর্কীস্তানে কুয়েনলুন পর্বতের নিকট তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণে খোটান নামে একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের আগেই এটি ছিল একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্যের রাজধানী। এখানে যে সব রাজা রাজত্ব করেন তাঁদের সকলের নামের প্রথম ভাগ ছিল 'বিজিত'। খননকার্যের ফলে যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা হতে জানা যায় খোটান ছিল প্রথমে একটি সমৃদ্ধশালী হিন্দুরাজ্য ও পরে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র। কাঠের ফলক, চর্ম, কাগজ রেশম খণ্ডের ওপর ভারতীয় অক্ষরে ও ভারতীয় ভাষায় লেখা লিপিগুলি হতে বেশ বোঝা যায় যে এখানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে অনেক বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার ছিল। হিউয়েন সাঙ খোটানের সমৃদ্ধির খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন।

হিউয়েন সাঙ ভারত হতে ফেরবার সময় খোটান পরিদর্শন করেন। তাঁর বিবরণ হতে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি খোটানের রাজা বিজিত সিং-এর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। খোটান রাজ্যে তখন একশো বৌদ্ধবিহার এবং পাঁচ হাজার ভিক্ষু ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষু এখানে বাস করতেন। ভাষা ছিল প্রাকৃত।

খোটানের ধর্ম ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ঐ ভাষায় 'ধর্মপদ' লেখা হয়েছিল।

খোটান রাজ্য ছাড়া কুচা রাজ্যও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। সংস্কৃত চর্চারও এটি একটি কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কুমারজীব ছিলেন
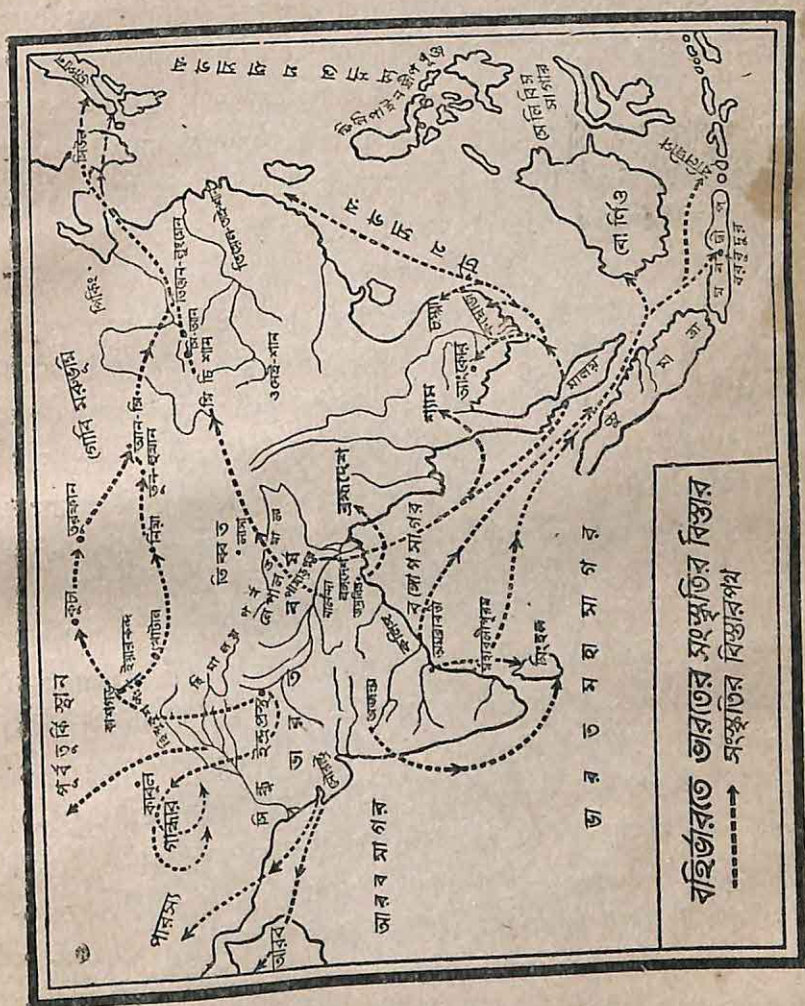
কুচা রাজ্যের অধিবাসী। তিনি কুচায় এবং চীন দেশে বিভিন্ন বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ করে ঐ ধর্ম প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন। হিউয়েন সাঙ যখন কুচায় যান তখন সেখানকার রাজা ছিলেন সুবর্ণদেব। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তুরফান ও

কারাসার (অগ্নিদেশ) রাজ্য দুটিও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। হিউয়েন সাঙ মধ্য এশিয়ার অনেক রাজ্যের নাম করেছেন যেখানে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এগুলির মধ্যে তুর্কী জাতীয় খানের রাজ্য ও বহ্লীক বা ব্যাকট্রিয়া প্রধান।

মধ্য এশিয়ায় খননকার্যের ফলে বহু সমৃদ্ধশালী নগরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খোটান, কুচা, তুরফান, টান্ হুয়াঙ ও অন্যান্য স্থানে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, বৌদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধমঠসমূহের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। তা ছাড়া ভারতীয় অক্ষরে ও ভাষায় লেখা নানারকম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া গেছে। টান হুয়াঙে অবস্থিত হাজার বুদ্ধের গুহার চিত্রশিল্পের তুলনা নেই। এটিকে 'মধ্য এশিয়ার অজন্তা' বলা হয়। বৌদ্ধধর্মই এই শিল্পের উৎস ছিল। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ অরেলস্টাইন বলেছেন, খোটান অঞ্চল ভ্রমণ করবার সময় তাঁর মনে হত তিনি যেন ভারতীয় কোন শহরে ভ্রমণ করছেন।

মধ্য এশিয়া দিয়েই ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বিখ্যাত ভারতীয় শ্রমণ কাশ্যপ মাতঙ্গ এবং ধর্মরত্ন চীনে যান। এরপর চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় ও বিহার নির্মিত হয়। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তিপূজা শুরু হয়। চীনের বহু লোক ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ভারতে বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও বৌদ্ধধর্মের মূলগ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রহের জন্য ভারতে আসতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিব্বত। পুরাকালে তিব্বত ভারতীয়দের নিকট অপরিচিত ছিল না। তিব্বতীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তিব্বতের রাজবংশ ভারতবর্ষের এক রাজপুত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় লিপির চর্চা তিব্বতে প্রবর্তিত হয়েছিল। সপ্তম শতকে রাজা স্রংসান গাম্পো তিব্বতে একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি খোটানে ব্যবহৃত ভারতীয় লিপি তিব্বতে প্রচলন করেন এবং তিব্বতীয় ভাষা ভারতীয় অক্ষরে লেখবার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক ভাল ছিল। ভারতের অন্যান্য স্থান হতে বৌদ্ধ-ধর্ম যখন প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকে সেই সময় বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম অধিকাংশ লোকের ধর্ম ছিল। বাংলা হতে পণ্ডিত শান্তরক্ষিত সপ্তম শতকে তিব্বতে যান সেখানকার রাজার আমন্ত্রণে। তিব্বতে বহু বৌদ্ধমঠও নির্মিত হয়।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ। দীপঙ্করের জন্ম বাংলাদেশের বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে। অল্প বয়সে তিনি দর্শন ও ধর্মনীতিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে

ওদন্তপুর বিহারের অধ্যক্ষ শীলরক্ষিত তাঁকে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি দেন। এরপর তিনি বিক্রমশিলা বিহারের অধ্যক্ষ হন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাবার উপক্রম হলে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভর আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং তাঁকে 'অতীশ' বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সম্মান জানান। তিব্বতে গিয়ে দীপঙ্কর যে সব বিহারে বাস করেছিলেন সেগুলিকে তিব্বতীয়রা অতি পবিত্র বলে মনে করে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চেষ্টায় তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়। অনেকের মতে, তিব্বতীয়দের যা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, সভ্যতা-সংস্কৃতি—এ সমুদয়ের মূল কারণ অতীশ দীপঙ্কর। তিব্বতী ভাষায় তিনি কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তিব্বতেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল জলপথে। এই যোগাযোগ কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এ সব অঞ্চলে রাজনৈতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয়দের নিকট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপগুলি সুবর্ণভূমি বলে পরিচিত ছিল। এদের ভারতীয় নামকরণ হয়, যথা কম্বোজ, চম্পা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ইত্যাদি।

চম্পা। প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল চম্পা। কথিত আছে চম্পা হতে একজন বণিক বর্তমান আন্নাম অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মাতৃভূমির নামানুসারে তাঁরা এই দেশের নাম দেন চম্পা। শম্ভুবর্মণ, হরিবর্মণ, জয়পরমেশ্বরবর্মণ প্রভৃতি শক্তিশালী রাজাদের শাসনে চম্পার অগ্রগতি প্রায় তের শ' বছর অব্যাহত ছিল। চম্পার হিন্দুরাজা চীনের প্রবল শক্তিশালী মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খানের আক্রমণ প্রতিহত করে অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেন। ওখানকার মন্দিরে শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, বিষ্ণু এবং কৃষ্ণমূর্তি খোদিত আছে। চম্পাতে বৌদ্ধধর্মেরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

কম্বোজ। এখনকার কাম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়ার প্রাচীন ভারতীয় নাম কম্বোজ। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে হিন্দুরা এই রাজ্য স্থাপন করেন। জনশ্রুতি আছে কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ এই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ষষ্ঠ শতকে কম্বোজ রাজ্য শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। চম্পা রাজ্যটিও কিছুদিন কম্বোজ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেছিল। ভববর্মণ, জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, সূর্যবর্মণ প্রভৃতি রাজারা কম্বোজ রাজ্যের বিস্তার ঘটান।

দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সপ্তম জয়বর্মণের রাজত্বকালে কম্বোজের খ্যাতি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি কম্বোজের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। তিনি এক নতুন বিরাট নগরী প্রতিষ্ঠা করে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরীই

আংকোরটোম। এর বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখলে এখনো বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। এই নগরীর চারদিকে যে পাথরের পাঁচিল ছিল তার পরিমাপ প্রায় ১৩ কিলোমিটার। ১০১ মিটার চওড়া যে পরিখা এই পাঁচিলকে ঘিরে আছে তার দু'ধার বড় পাথর দিয়ে ঢাকা। এই রাজধানীর সিংহদ্বারের খিলান ৩০ ফুট উঁচু ছিল। বিরাট বিরাট হাতী

আঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির

আরোহী নিয়ে এর ভেতর দিয়ে স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারত। রাজধানী বহু মন্দির ও প্রাসাদে পরিপূর্ণ ছিল। এর মধ্যে বেয়ন মন্দিরটি কম্বোজ শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এহ মন্দিরটি বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বরের।

রাজধানীর মধ্যে জলাশয়, বিচিত্র কারুকার্যে শোভিত প্রাসাদ ও মন্দির মানুষকে মুগ্ধ করত। তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর অন্যতম ছিল আংকোরটোম।

যশোধরপুরের দক্ষিণে দু' কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আঙ্কোরভাট মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি স্থাপত্য শিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন। মন্দিরটি পৃথিবীর মধ্যে আকারে বৃহত্তম, সৌন্দর্যে অনুপম। রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ (১১১২—১১৬০ খৃঃ) এই মন্দির নির্মাণ করেন। শিব, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ ও অর্জুনের উপাখ্যান নিয়ে এই মন্দিরের বিখ্যাত চিত্রগুলি অঙ্কিত। মন্দিরটিকে ঘিরে চারদিকে পাথরের পাঁচিল এখনো অটুট আছে। এই পাঁচিল ঘিরে রয়েছে ৬৫০ ফুট প্রশস্ত পরিখা। এই পরিখা পার হবার জন্য যে পাথরের সেতু আছে তা ৩৬ ফুট চওড়া। এই মন্দিরের শিখরটি ২১০ ফুট উঁচু। আঙ্কোরভাটের বিশালতা, নির্মাণ-কৌশল ও কারুকার্য একসঙ্গে এই তিনের সমন্বয় পৃথিবীতে অপর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও বলি দ্বীপ। সুপ্রাচীন কাল হতেই এসব অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এসব স্থানে যে সব 'শাসন' পাওয়া গেছে

তা হতে জানা যায় যে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাব সেখানে বিস্তারলাভ করে। এই স্থানে ভারতীয় লিপির ব্যবহার ছিল। সংস্কৃত চর্চাও এসব অঞ্চলে খুব ভালোভাবে হত। শ্রীবিজয় সংস্কৃত চর্চার একটি বড় কেন্দ্র ছিল।

অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতে শুরু করেন। এঁরা একে একে সুমাত্রা, জাভা ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেন। এই বংশ চারশ' বছর ধরে এই অঞ্চল শাসন করেন। ভারত ও চীনের সঙ্গে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছিল। এই বংশের অধীনে পনেরটি করদ রাজ্য ছিল। সাম্রাজ্যের মূল শক্তিকেন্দ্র ছিল মালয় উপদ্বীপ।

শক্তিশালী নৌ-বাহিনী, অতুল ঐশ্বর্য ও অনবদ্য স্থাপত্য কীর্তির জন্য শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। যবদ্বীপ বা জাভায় বিশ্ববিখ্যাত বরবুদুর মন্দির এদের শিল্পানুরাগের নিদর্শন হিসেবে আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে।

যবদ্বীপ বা বর্তমান জাভার কেন্দ্রস্থলে ছোট পাহাড়ের ওপর বরবুদুরের ছয়তলা মন্দির অষ্টম শতকে নির্মিত হয়। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে চারশ' ফুট পরিধিসম্পন্ন এই মন্দিরটি স্তরে স্তরে উঠে গেছে। প্রতি স্তরে চারশ' ছত্রিশটি বুদ্ধমূর্তি রয়েছে।
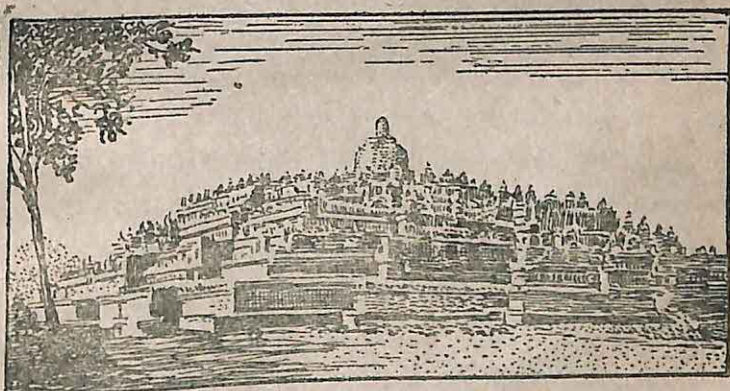
বরবুদুরের মন্দির

এ ছাড়া মন্দিরগাত্রে জাতকের কাহিনীগুলি খোদিত রয়েছে। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত স্তূপকে ৭২টি স্তূপ চক্রাকারে বেষ্টন করে আছে। এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ বৌদ্ধ তারাদেবী। শিল্পকলার দিক থেকে বিচার করলে বরবুদুর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তিগুলির অন্যতম। এত বড় বৌদ্ধ মন্দির পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

যবদ্বীপ। যবদ্বীপ নামটির উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায়। ভারতীয় হিন্দুরা বহু প্রাচীনকালেই এখানে বসতি স্থাপন করেন। এখানে প্রথমে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এখানে খুবই সমাদৃত হত। গুণবর্মণ যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা এক উন্নততর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল। তারা এক অতি উচ্চস্তরের সভ্যতা সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়। ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সামাজিক নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান, ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্প এই অঞ্চলে এক বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার পত্তন করে। কয়েক শ' বছর কেটে গেলেও সেই সভ্যতার প্রভাব এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে আজও পরিলক্ষিত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতে সুলতানী যুগ

একাদশ শতকের শুরুতে ভারত শতধা বিভক্ত ছিল। এই সুযোগে গজনীর সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন। ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য তিনি ভারত আক্রমণ করেন নি। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করা। ভারতের প্রধান প্রধান নগর ও মন্দিরগুলি তাঁর আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের প্রায় দেড়শ' বছর পরে মহম্মর ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। তিনিই ভারতে যথার্থ মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে একটি স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করা। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানকে তিনি পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের ফলে রাজপুত জাতির সামরিক শক্তি ও মনোবল ভেঙে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম শক্তির বিজয় পতাকা উত্তর ভারতের বুকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়।

সুলতানী শাসনের শুরু। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক নিজেকে ভারতবর্ষের সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে সুলতানী যুগ শুরু হয়। তিনি যে রাজবংশ স্থাপন করেন তা ইতিহাসে 'দাস বংশ' নামে খ্যাত। কুতুবউদ্দিনের শাসনকাল হতে (১২০৬ খ্রীঃ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত যুগটিতে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এগুলি হল যথাক্রমে দাস বংশ (১২০৬-১২৯০ খ্রীঃ), খলজী বংশ (১২৯০—১৩২০ খ্রীঃ), তুঘলক বংশ (১৩২০—১৪১৩ খ্রীঃ), সৈয়দ বংশ (১৪১৪ – ১৪৫১ খ্রীঃ) এবং লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬ খ্রীঃ)।

দাস বংশ। কুতুবউদ্দিন মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা ইলতুৎমিস দিল্লীর সুলতান হন। তিনি নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে ভারতে নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। দিল্লীর পরবর্তী দক্ষ সুলতান হলেন গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৫—১২৮৭ খ্রীঃ)। তিনি প্রথমেই রাজ্যমধ্যে

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে উদ্যোগী হন। এর জন্য তিনি একটি শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মঙ্গোলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যও তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে দিল্লী মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হয়।

খলজী বংশ। বলবনের মৃত্যুর পর দাস বংশের অবসান ঘটে সেনাপতি জালালউদ্দিন খলজীর হাতে। তিনিই খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁরই পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনের হাতে নিহত হন।

আলাউদ্দিন হলেন সুলতানী যুগের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সুলতান। ভারতে মুসলমান নরপতিদের মধ্যে তিনিই প্রথম সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গঠনের কৃতিত্বের অধিকারী।

আলাউদ্দিন

আলাউদ্দিন সর্বপ্রথম গুজরাট অধিকার করেন। এর পর একে একে রণথম্ভোর, চিতোর, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধারা, চন্দেরী ও মালব জয় করেন। উত্তর ভারত জয়ের পর তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারত বিজয়ের ভার দেন মালিক কাফুরের ওপর। তিনি একে একে দক্ষিণ ভারতের রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। এইসব রাজারা আলাউদ্দিনের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের দেবগিরি ছাড়া অন্যান্য রাজ্যগুলিকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুদূরে দিল্লী হতে দক্ষিণ ভারত সরাসরি শাসন করা অসম্ভব। আলাউদ্দিন কেবল দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন না, শাসকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র কঠোরহস্তে দমন করেন। তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেঁধে দেন এবং ব্যবসায়ীরা যাতে বেশি দাম না নিতে পারে সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

তুঘলক বংশ। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খলজী বংশের পতন ঘটে। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে তুঘলক বংশের শাসন শুরু করেন।

তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান হলেন **মহম্মদ-বিন-তুঘলক**। তাঁর ছাব্বিশ বৎসর স্থায়ী রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর রাজত্বকালে সুলতানী সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে করোমণ্ডল উপকূল এবং পশ্চিমে আরব সাগর হতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। তাঁর আমলে দক্ষিণ ভারত সরাসরি সুলতানি শাসনের অধীনে আসে।

মহম্মদ বিন-তুঘলক

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসননীতি উদার ছিল। তাঁর মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। কিন্তু প্রজার হিত করতে গিয়ে তিনি তাদের মতামত ও সুবিধা-অসুবিধাকে বিন্দুমাত্র মূল্য দেন নি। নিজের বাসনা বাস্তবে পরিণত করতে গিয়ে তিনি তাদের অশেষ ক্ষতি-সাধন করেন। দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি, দিল্লী হতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, দেশে তামার নোট প্রচলন, খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা, হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত রাজ্যগুলি জয় করার প্রচেষ্টা প্রভৃতি কার্যগুলি তাঁর সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাঁর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইসব বিদ্রোহ দমনে তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ সুলতান হন। তিনি প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন, কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষা করবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফলে তাঁর জীবদ্দশায় তুঘলকী সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে।

সুলতানী শাসনের অবসান। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর সুলতানী শাসন দিল্লী ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুলতানী শাসনের এই এই দুর্বলতার সুযোগে তৈমুরলঙ ভারত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে দিল্লীর রাজশক্তি একেবারে ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নেন ও সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ বংশের বিলোপসাধন করে বহলুল লোদী লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এই বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত ও নিহত করে মুঘল বীর বাবর ভারতে মুঘল যুগের সূচনা করেন (১৫২৬ খ্রীঃ)।

সুলতানী শাসনে ভারত

সুলতানী যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। সুলতানি আমলে স্বৈরতন্ত্র প্রচলিত ছিল। একমাত্র সামরিক শক্তির উপর ভিত্তি করে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। অত্যাচারের দ্বারা হিন্দুদের পদানত রাখা ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। সুলতানের কাজে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও ছিল না। সেনানায়কদের ওপর বিভিন্ন অঞ্চল শাসনের ভার ছিল। সাম্রাজ্যকে

বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। মুসলমান অভিজাতদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দেওয়া হত। প্রজাসাধারণ অধিকাংশই ছিল হিন্দু। তাদের অধিকার বলে কিছু ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। এ দেশে তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে রাজকার্যে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হত।

সামাজিক অবস্থা। ভারতে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়। মুসলমানরা তাদের পৃথক ধর্মীয় ও সামাজিক গঠন, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার নিয়ে হিন্দুদের হতে পৃথক্‌ভাবে জীবন যাপন করতে থাকে। ফলে ভারতীয় সমাজ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়—হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজ। এই দুই সমাজ পরস্পরের পার্থক্য রক্ষায় বিশেষ সচেতন ছিল। উভয় সমাজের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান ও মিলনের ক্ষেত্র প্রথমদিকে ছিল না বললেই হয়।

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার ফলে মুসলমানরা সমাজ জীবনে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। শাসন বিভাগের উঁচু পদগুলি তাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তারা ছিল সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির লোক থাকায় ঐক্যবোধ ছিল না। তাদের পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদের ফলে শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দেয়। কৃষকশ্রেণী ছিল সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে। ক্রীতদাসের সংখ্যা সুলতানী যুগে বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক অবস্থা। সুলতানী যুগে মুসলমানদের সংখ্যা কম থাকায় এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করায় দেশের চাষ-আবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকাংশই ছিল হিন্দুদের হাতে। ইউরোপ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। গ্রামে কুটির শিল্প ও শহরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রচলন ছিল। ধাতুশিল্প, চর্মশিল্প প্রভৃতি সে যুগে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। কোন কোন সুলতানী রাজকীয় কারখানা স্থাপন করে বস্ত্রশিল্প ও বাসনপত্র, বিলাস সামগ্রী প্রভৃতি নির্মাণে সাহায্য করতেন। বস্ত্রশিল্পের জন্য বাংলা ও গুজরাট প্রসিদ্ধ ছিল। দেশের অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী।

জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিল সত্য, কিন্তু সাধারণ লোকের কেনবার ক্ষমতা ছিল না বললেই হয়। অভিজাত শ্রেণীর জীবনে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন ছিল শোচনীয়। কবি আমীর খসরু তাই বলেছিলেন যে রাজ-মুকুটের প্রতিটি মুক্তা ছিল দরিদ্র কৃষকের ঘনীভূত রক্ত ও অশ্রুবিন্দু।

হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। হিন্দু ও

মুসলমান সভ্যতার পরস্পর সংশ্রব কেবলমাত্র সংঘাতেরই সৃষ্টি করে নি, এ দুই ধর্মের জনসাধারণ বহুদিন ধরে একত্রে বসবাস করার ফলে পরস্পর ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুটা সহিষ্ণু হয় এবং পরস্পরের আচার-ব্যবসার অনুসরণ করতে থাকে। মুসলমান পণ্ডিতেরা হিন্দুধর্মের সংস্কৃত পুস্তক পাঠ ও অনুবাদ করতে থাকেন। হিন্দু পণ্ডিতেরাও মুসলমানদের জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানচর্চা করতে শুরু করেন। উর্দু ভাষা সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলনের ফলেই উদ্ভব হয়েছিল। মুসলমান লেখকরা হিন্দী ভাষায় এবং হিন্দু লেখকরা ফারসী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এইভাবে সুলতানী যুগে উভয় সম্প্রদায়ই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে পরস্পরের শিল্পরীতি, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলা, সঙ্গীত, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি আদান-প্রদান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।
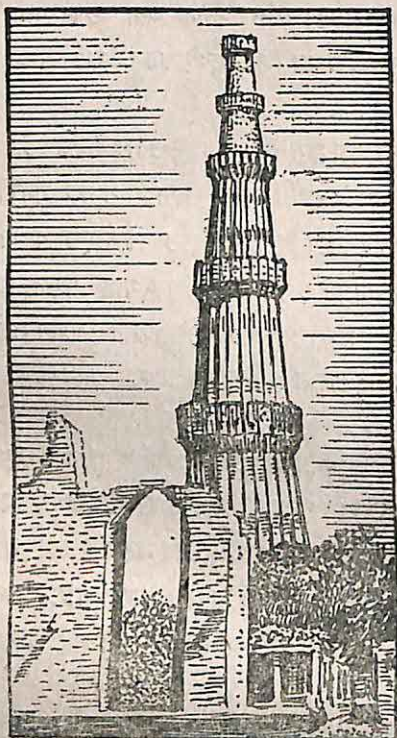
কুতুব-মিনার

হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার ফলে সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এ যুগের স্থাপত্য শিল্প। স্থাপত্য কীর্তির মধ্য দিয়েই হিন্দু ও মুসলমান শিল্প-সৃষ্টির সংমিশ্রিত ধারা রূপলাভ করে। মুসলমানদের মসজিদ, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে হিন্দুরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুলতানী আমলের স্থাপত্য রীতিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—দিল্লী রীতি ও প্রাদেশিক রীতি। দিল্লী রীতির নিদর্শন হচ্ছে কুতুব মিনার, আলাই দরওয়াজা প্রভৃতি। আর প্রাদেশিক রীতি গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশে, গুজরাট ও মালব রাজ্যে। বাংলার ছোট সোনা মসজিদ, আদিনা মসজিদ, এবং গুজরাটের জাম-ই-মসজিদ প্রাদেশিক রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ভক্তিবাদ। সুলতানী যুগে হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার বৈষম্য ও বিরোধকে অতিক্রম করে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার মনোভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ভক্তিবাদ। ভক্তিবাদের মূল কথা হল অন্তরের পবিত্রতা, ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি, সৎকাজ, সদাচারণ ও একেশ্বরে বিশ্বাস। ভক্তিবাদে আচারবহুল ধর্মে বিশ্বাস করে না। এই সময়

মুসলমান ধর্মে সুফীবাদের আবির্ভাব ঘটে। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই এই ধারণা সুফীবাদ প্রচার করেছিল।

ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিল। ভক্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে রামানন্দ, কবির, শ্রীচৈতন্য, নামদেব এবং নানক প্রধান। সুফীবাদের প্রচারকদের মধ্যে নিজামউদ্দিন আউলিয়া ও মইনউদ্দিন চিশ্‌তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য। মধ্যযুগের ভক্তিবাদের আচার্যদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস নেন। তখন হতে তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। ভারতের বহুস্থানে ভ্রমণ করে তিনি প্রেম ও বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করেন। জীবে দয়া, ঈশ্বরের নাম কীর্তন ও ভগবদ্ভক্তি তাঁর উপদেশের মূলকথা। এ যুগে অন্যান্য ধর্ম-প্রচারকদের মতো তিনিও জাতিভেদ প্রথা মানতেন না।

নানক। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর জেলার তালওয়ান্দি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহুস্থান এমনকি মক্কা ও মদিনা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের মিথ্যা ভাষণ, কপটতা ও আত্মসুখ ত্যাগ করতে বলতেন। তিনি মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথার

নানক

বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান একই ঈশ্বরের সন্তান—একথা তিনি প্রচার করতেন। গুরু নানকের অনুগামীদের শিখ বলা হয়।

কবীর। মধ্যযুগের আর এক জন বিখ্যাত সাধক বা সন্ত হলেন কবীর। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু মতভেদ নেই তাঁর প্রচারিত বাণীর সহজ ও সরল মহিমা নিয়ে। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করতেন না। তাঁর মূল কথা ছিল যে, যিনি হিন্দুর ঈশ্বর তিনিই মুসলমানের আল্লা। বেদ ও কোরাণ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা মাত্র।

কবীর

সুলতানী আমলে বাংলাদেশ

দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলা জুড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের নাম 'ইলিয়াস শাহী' বংশ। এই বংশ একশ' বছরের ওপর বাংলাদেশ শাসন করেছিল। এই সময় বাঙালীরা সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে ছিল।

হুসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ) হলেন মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি সহনশীলতার নীতির দ্বারা হিন্দু প্রজাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি বহু হিন্দু তাঁর কর্মচারী হিসেবে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহী শাসনের অবসান ঘটে।

ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশ দুটি প্রায় দু'শ' বছর বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দুটি বংশের অবদান ভোলবার নয়। এই দুই বংশের সুলতানদের শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন। দুই সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বসবাসের ফলে একের আচার-ব্যবহার অপরের আচার-ব্যবহারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। কালক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আরাধ্য দেবতার একটা সমন্বয় দেখা দিল। হিন্দুরা মুসলমান পীরকে দেবতার আসনে বসিয়ে

সত্যনারায়ণ ত্রিলোক-পীরের পূজা শুরু করে। মুসলমানরাও গঙ্গা দেবী, ওলাবিবি, শীতলার পূজা আরম্ভ করে। সত্যপীরের পূজা উভয় সম্প্রদায়ই করত।

ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশীয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ এই যুগে করা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চাও এই সময় ভালোভাবেই হত। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় নবদ্বীপ তখন ভারত বিখ্যাত ছিল।

এ যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। বিদেশী পর্যটক মাহুয়ান, বারথেমা ও ইবন বতুতা বাংলাদেশে প্রস্তুত জিনিসপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সূতীদ্রব্য রপ্তানিতে বাংলা তখন শ্রেষ্ঠ স্থানে ছিল। এ ছাড়া অন্যান্য পণ্যসামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দামও খুব সস্তা ছিল। ভারতের অন্য কোথাও এত কম দামে জিনিসপত্র পাওয়া যেত না। পর্যটক ও ঐতিহাসিক ইবন বতুতা একথা উল্লেখ করেছেন। বাংলার গ্রামাঞ্চলও অর্থনৈতিক দিক হতে আত্মনির্ভরশীল ছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

সমাপ্তির পথে মধ্যযুগ

কনস্টাণ্টিনোপলের পতন। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টাণ্টিনোপলের পতন ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনা একদিনে ঘটে নি। এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে এক রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপল ছাড়া আর কোন অঞ্চলই অবশিষ্ট ছিল না। এই বিরাট সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নেয় ওসমানলী তুর্কীরা। তারা ইউরোপে 'অটোমান' নামে পরিচিত।

ওসমান বা ওসমান আলী ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তুর্কীরা বসফোরাস প্রণালী পার হয়ে ইউরোপের কিছুটা অঞ্চল দখল করে নেয় এবং কনস্টাণ্টিনোপলের কয়েক মাইল দূরে তারা অবস্থান করতে থাকে। ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজাণ্টাইন সম্রাট সাহায্যের জন্য তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত ইমানুয়েল চেরিসোলেরাসকে ইটালীতে পাঠান। ইটালী হতে কিন্তু কোন সাহায্য পাঠান হল না। কনস্টাণ্টিনোপলের অধিবাসীরা পোপের কর্তৃত্ব মেনে নেয় নি বলে পোপ তথা রোমান ক্যাথলিক চার্চ কনস্টাণ্টিনোপলের বিপদকে স্বাগত জানান। চেরিসোলেরাসের দৌত্য ব্যর্থ হল। কিন্তু তিনি আর কনস্টাণ্টিনোপলে ফিরে গেলেন না। ইটালীর ফ্লোরেন্সে রয়ে গেলেন। শীঘ্রই তিনি গ্রীক পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেন। অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট গ্রীক ভাষা শিখতে শুরু করে। অন্যান্য গ্রীক পণ্ডিতরাও তাঁর দেখাদেখি ইটালীতে চলে আসতে থাকেন।

এদিকে কনস্টাণ্টিনোপলের অবস্থা সঙ্গীন হল। তবে এর চারিদিকের দুর্ভেদ্য প্রাচীর আরও ৫০ বছর কনস্টাণ্টিনোপলকে টিকিয়ে রাখল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শহরটি অবরোধ করেন এবং অবিরামভাবে প্রাচীরের ওপর গোলাবর্ষণ করতে থাকেন। কনস্টাণ্টিনোপলের অধিবাসীরা বীরবিক্রমে বাধা দিয়েও তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না। তুর্কী সৈন্যরা নগরে প্রবেশ করে হত্যালীলা চালায়। সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। অধিকাংশ অধিবাসীদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হল। বিখ্যাত গির্জা ও রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করা হল, সেণ্ট সোফিয়ার অপূর্ব প্রাচীরচিত্রগুলিও রেহাই পেল না।

রেনেসাঁসের সূচনা। কনস্টাণ্টিনোপলের পতন ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর সাথে হাজার বছরের বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মুসলমানদের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য বহু গ্রীক পণ্ডিত ইটালীর নানা শহরে তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে চলে গেলেন। ব্যবসা ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সাথে ইটালীতে

সাহিত্য ও শিল্পচর্চার অনুকূল পরিবেশে গড়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও দর্শনের পুঁথি পেয়ে ইটালীর পণ্ডিতরা নতুন উদ্যমে শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন। ফলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটল, যাকে ইতিহাসে 'রেনেসাঁস' বলা হয়। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের পতনের বহু আগেই এর সূচনা হয়েছিল।
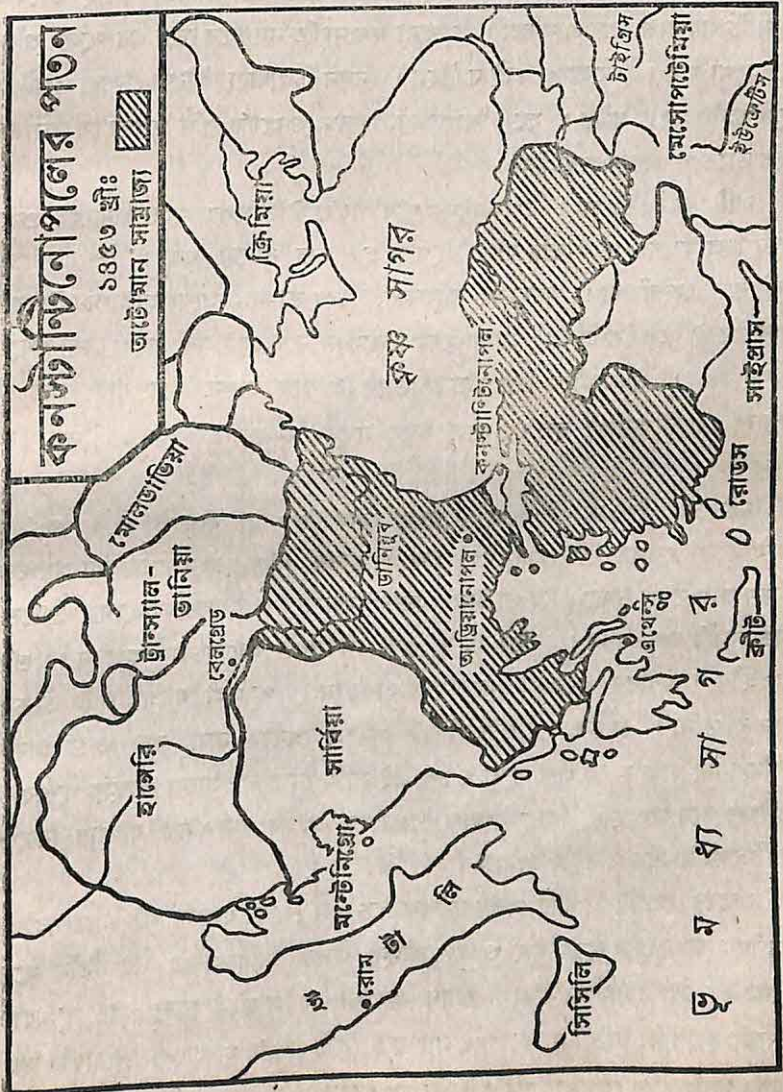
রেনেসাঁসের অর্থ হল নতুন করে জানা বা নবজাগরণ। শব্দগত অর্থ হল 'পুনর্জন্ম'। অর্থাৎ অতীতের স্বর্ণযুগে আবার ফিরে আসা। অতীতের স্বর্ণযুগ বলতে ইউরোপীয়রা বুঝত গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্যের সবচাইতে গৌরবময় অধ্যায়। পনের ও ষোল শতকে আবার যেন অতীতের সেই গৌরবময় যুগ ফিরে এল। এর অবশ্য প্রস্তুতি চলেছিল সেই ক্রুসেডের সময় থেকেই। ক্রুসেড প্রত্যাগত লোকেরা নতুন নতুন জিনিসপত্র ইউরোপে নিয়ে আসে। তারা কেবল জিনিসপত্রই আনেনি, নতুন চিন্তাধারাও নিয়ে এসেছিল। কখনো কখনো জিনিসপত্রের চেয়ে এর মূল্য অধিক হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। নতুন চিন্তাধারা ইউরোপীরদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটায়। ফলে শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রতি তাদের যে মনোভাব ছিল তাতে পরিবর্তন দেখা দিল।

আবিষ্কারের প্রেরণা। রেনেসাঁসের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের ব্যক্তি-মানুষের প্রধান লক্ষ্য ছিল মৃত্যুর পর আত্মার যাতে সদ্গতি হয় তার ব্যবস্থা করা। ঈশ্বর ছিলেন সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। মানুষের কাজকর্ম, চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। রেনেসাঁসের মানুষরা নিজেদেরই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করল। মানবজীবন আরও ভালোভাবে কি করে যাপন করা যায় তারা সে সম্বন্ধে বেশী আগ্রহী হল। ফলে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারের দিকে তারা নজর দিল।

মধ্যযুগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান ছিল না বললেই হয়। চার্চ বা ধর্মযাজকরা শেখাত যে মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক শক্তির রহস্য বের করা অসম্ভব। কারণ জাগতে যা কিছু ঘটবে তা ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট। এ কারণে মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানচর্চা করতেন না। তাঁরা ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধেই আলোচনা করতেন। তাঁরা অর্থহীন কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। পৃথিবী যে গোলাকৃতি তা চার্চ মনে করত না। চার্চের মতে পৃথিবী হল সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় যার ওপর আকাশ সামিয়ানার কাজ করছে এবং সূর্য ও চন্দ্র এই সামিয়ানায় আটকানো অবস্থায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক এইসব কাল্পনিক ধারণার বিরুদ্ধে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানালেন।

জ্ঞানের প্রসার। রজার বেকন চৌম্বক সূচ এবং বিশেষ ধরনের কাঁচ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পথ তিনি সুগম করেন। এরপর কোপার্নিকাস প্রমাণ করলেন যে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। এটি চার্চের মতবাদের বিরোধী ছিল। এরপর গ্যালিলিও, কেপলার প্রমুখ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে প্রাকৃতিক জগতের নতুন

নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হতে থাকায় মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়তে থাকে এবং জন-সাধারণের মন ক্রমে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়।

যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাব ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ। নতুন যুগের সূচনায় মানুষ যুক্তি দিয়ে সবকিছু প্রশ্নের সমাধান করতে সচেষ্ট হল। এই সময় ইটালীর বিভিন্ন শহরে এক নতুন ধরনের বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এ সব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, গণিত, গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য পড়ান হত। প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন চর্চার ফলে ইউরোপের শিক্ষিত লোকেরা দেখলেন বহুশত বৎসর পূর্বে গ্রীক ও রোমানরা কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বই আলোচনা করত না ; মানব জীবনের প্রয়োজনীয় আরও বহু তত্ত্বের তারা চর্চা করত। সেকালের দর্শন পড়ে তারা জানলেন যে তখনকার পণ্ডিতেরা বিনাবিচারে কোনকিছুই গ্রহণ করতেন না, সবকিছুই বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতেন।

ইটালীর পণ্ডিতরা স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা লাভ করেই চুপ করে রইলেন না। তাঁরা গ্রন্থ রচনায় মন দিলেন। ইটালীতে কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের আবির্ভাব ঘটে চতুর্দশ শতকে। তাঁদের মধ্যে দান্তে, পেত্রার্ক ও বোকাসিও প্রধান। এঁরা হলেন রেনেসাঁসের অগ্রদূত। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অন্যতম। পেত্রার্ক ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থ রচনা না করে দেশীয় ভাষায় তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। এটা একটা বিরাট পরিবর্তন। ল্যাটিনকে দেবভাষা বলা হত এবং যাজকরাই এটা ভাল জানতেন। দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচিত হওয়ায় অধিক সংখ্যক মানুষ গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পেতে থাকে। বোকাসিও ছিলেন মহাপণ্ডিত। এঁদের অনুগামীরা প্রাচীন যুগের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি পাঠ করে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন প্রাচীন কালের মানুষের চিন্তাশক্তি কত উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। মানসিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের পটভূমিকা হিসেবে ইউরোপে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ল। পোপের নেতৃত্বে ধর্মীয় ঐক্যের ধারণাও ধাক্কা খেল। জনসাধারণ নিজ নিজ দেশের নাগরিক বলতে গর্ববোধ করত। অখণ্ড খ্রীস্টান রাষ্ট্রের ধারণা তারা মুছে ফেলল। একই দেশে পুরুষানুক্রমে দীর্ঘদিন একত্রে বসবাসের জন্য সে অঞ্চলের বাসিন্দারা স্বভাবতই স্বকীয় একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। জাতির এই নব-রূপায়ণেই নেশন বা জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। মধ্যযুগে সামন্ত প্রথার বাঁধনে সমাজ ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেজন্য কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা রাজার প্রতি কারও অনুগত ছিল না। কিন্তু কালক্রমে সামন্ত প্রথাও ভেঙে পড়তে থাকে। জনসাধারণ তখন প্রয়োজনের তাগিদে এক নতুন জাতীয়তার প্রেরণায় দেশে এক রাজাকেই জাতির প্রতীক ও প্রভুরূপে বরণ করে নিল।

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন একদিনে হয় নি। ধীরে ধীরে এটি ঘটেছিল। মধ্যযুগের অবসানকালে পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বিশেষ বিশেষ জাতি ও তাদের জাতীয় রাষ্ট্র এমনি করে গড়ে উঠতে লাগল। তন্মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী ও স্প্যানিশ এই তিনটি জাতি ও তাদের রাষ্ট্র ছিল অগ্রগণ্য। এইসব রাষ্ট্রের গঠন ছিল রাজতন্ত্র।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইংলণ্ড একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল। টিউডর যুগে সামন্ত শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং মধ্যবিত্ত ও বণিক শ্রেণীর সাহায্যে টিউডর রাজারাও স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অবশ্য স্টুয়ার্ট আমলে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে জনসাধারণ বিদ্রোহ করে এবং রাজার সঙ্গে এই সংঘর্ষে প্রজাদের জয় হয়। কয়েক বছরের জন্য ইংলণ্ড প্রজাতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছিল। কিন্তু এখানেই এই বিরোধের শেষ হল না। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের 'গৌরবময় বিপ্লবে'র ফলে এই সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জয় হয়। ফ্রান্সের ভেলয় বংশীয় রাজারা সমগ্র দেশকে রাজার কর্তৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সফল হন। ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক সংহতি সুদৃঢ় হবার ফলে ছোট বড় বহু ইউরোপীয় দেশ পঞ্চদশ শতকে রাষ্ট্রনৈতিক দিক্ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ফার্ডিন্যান্দ ও ইসাবেলার শাসনকালে জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে স্পেন রাজ্য গড়ে ওঠে। এই যুগেই স্পেনীয় নৌশক্তি ও নৌ-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে।

ভৌগোলিক আবিষ্কার ঃ ইউরোপের বিস্তার। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মোঙ্গল খানদের শাসনকালে চীন হতে ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মোঙ্গলদের ক্ষমতা ধ্বংস হলে এই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। প্রাচ্য দেশে বাণিজ্যের নতুন পথ আবিষ্কারের জন্য জাতীয় রাষ্ট্রগুলির বণিকদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী পড়ে তারা এ ব্যাপারে আরও উৎসাহী হল। পর্তুগালের যুবরাজ হেনরী এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। নতুন জ্যোতির্বিদ্যা এবং দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র সমুদ্রযাত্রার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে সম্ভাবনাময় করে তুলল। জেনোয়া, ভেনিস, পর্তুগাল ও স্পেনের বণিকরা জলপথে প্রাচ্যের পথ সন্ধানে সচেষ্ট হল। পর্তুগালের বার্থোলেমিউ ডিয়াজ দক্ষিণ আফ্রিকার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উপকূল হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরলেও ঝঞ্ঝা অন্তরীপের নাম দেওয়া হল উত্তমাশা অন্তরীপ। এই পথ ধরেই ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছলেন (১৪৯৮ খ্রীঃ)। অপরদিকে কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে নতুন আশা জাগালেন আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করে। ইংলণ্ডের ক্যাবট ভ্রাতৃদ্বয় নিউফাউন্ডল্যাণ্ড আবিষ্কার করলেন। নতুন এইসব ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল হল সুদূরপ্রসারী। ইউরোপের জীবনে ভূমধ্যসাগরের প্রাধান্য বিলুপ্ত হল। আটলাণ্টিকের সমুদ্রপারে পর্তুগাল, স্পেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকেরা মাথা তুলল। পৃথিবী সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধারণার অবসান হল এবং বৃহত্তর পৃথিবীর ধারণা বাস্তবে রূপ লাভ করল।

সুতরাং ইউরোপে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটেছিল নানাদিকে বিপুল পরিবর্তনের সূচনার মধ্যে। এ কারণে নতুন যুগটি যথার্থই রেনেসাস নামে অভিহিত হয়েছে।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। মানব সভ্যতার ইতিহাসকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়? ইউরোপের ও ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস বলিতে কি বোঝ?

২। 'মধ্যযুগ' কথাটির অর্থ কি?

৩। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য কি কি? মধ্যযুগে রূপান্তর কিভাবে ঘটে?

৪। মধ্যযুগের শেষে নতুন সমাজ, নতুন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝ?

৫। ভারতে মধ্যযুগের সূচনা কিভাবে হয়েছিল? ভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটে কখন?

৬। ইতিহাসে যুগ বিভাগ নির্দিষ্টভাবে করা যায় না কেন?

৭। 'ইতিহাসে কোন যুগই পরস্পর সম্পর্কহীন নয়'—এর অর্থ কি? কোন্ কোন্ বছরকে মধ্যযুগের সমাপ্তিকাল বলে ধরা হয় এবং কেন?

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) মধ্যযুগের সমাজ ছিল —— সমাজ। এই সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল —— প্রথা।

(খ) মধ্যযুগের জনসাধারণের ওপর —— প্রভাব ছিল অসীম। তারা —— কথা অমান্য করতে পারত না।

৯। সঠিক কথাটির নীচে দাগ দাও ঃ

'মধ্যযুগ' কথাটি ব্যবহার করেছে —— প্রাচীন যুগের লোকেরা, মধ্যযুগের লোকেরা, আধুনিক যুগের লোকেরা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি কখন থেকে ঘটতে থাকে? রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কিভাবে জার্মান বর্বর জাতিরা বসতি স্থাপন করে?

২। 'হূন' কাদের বলা হত? তারা ইউরোপে আক্রমণ শুরু করে কখন থেকে? এর ফল কি হয়েছিল?

৩। এলারিক কে ছিলেন? এলারিকের রোম আক্রমণের বিবরণ দাও।

৪। হূন নেতা এটিলার ইউরোপ ও রোম সাম্রাজ্য আক্রমণের বিবরণ দাও।

৫। গেসেরিক কে ছিলেন? তাঁর রোম আক্রমণ সম্বন্ধে কি জান?

৬। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান কিভাবে ঘটে? রোম সভ্যতার অবসান ইউরোপের লোক ভুলতে পারল না কেন?

৭। জার্মান উপজাতিদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল ? তাদের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান ? জার্মানদের কয়েকজন দেব-দেবীর নাম লেখ।

৮। ইউরোপের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বর্বর জাতিদের আক্রমণের পথগুলি দেখাও ঃ—হূনদের প্রথম (৩৭৫ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় আক্রমণ (৪৫১ খ্রীঃ), ভিসিগথদের রোম আক্রমণ, ভ্যাণ্ডালদের রোম আক্রমণ।

৯। সঠিক উত্তর খুঁজে বের কর ঃ

হূনদের নেতা ছিলেন (এটিলা, ওডন্, এলারিক, গেসেরিক)।

১০। (ক) পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে (৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে, ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে, ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে)।

(খ) এলারিক রোম আক্রমণ করেন (৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে, ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে)।

(গ) গেসেরিক রোম আক্রমণ করেন (৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে, ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে)।

(ঘ) হূনরা প্রথম ইউরোপে এসে পূর্বগথদের বাসস্থান দখল করে নেয় (৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে)।

১১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) রোম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ —— —— নেতা এলারিক পুরোপুরি কাজে লাগালেন।

(খ) জার্মান উপজাতিদের মধ্যে —— ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। কয়েকটি —— তৈয়ারী হত —, — বা গ্রাম।

(গ) আকাশের দেবতা ——, পৃথিবীর দেবতা ——, বজ্রের দেবতা ——, যুদ্ধের দেবতা ——, অগ্নির দেবতা —— এবং উৎপাদনী শক্তির দেবী ——।

১২। নীচের ধাঁধাটি থেকে যে কোন দুজন বিখ্যাত লোকের নাম খুঁজে বের কর ও এঁদের বিষয়ে অন্ততঃ দু লাইন লেখ ঃ

লা এ টি ক গে রি সে ক।

তৃতীয় অধ্যায়

১। ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা কখন থেকে শুরু হয় ? এই যুগকে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয় কেন ?

২। " 'অন্ধকার যুগ' বলা যায় না"—এই কথাটির অর্থ কি ?

৩। 'অন্ধকার যুগের' ইউরোপে খ্রীষ্টান চার্চের অবদান কি? পাপপুণ্য সম্বন্ধে চার্চের ধারণা কি ছিল?

৪। পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণের ওপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব নিজের ভাষায় লেখ।

৫। সঠিক উত্তর খুঁজে বের কর ঃ

(ক) হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদ করেন (জেরোম, অগাষ্টিন, আমব্রোজ)।

(খ) মধ্যযুগে যে সম্রাট নিরক্ষর ছিলেন তাঁর নাম (জুলিয়াস সিজার, মার্কাস অরেলিয়াস, শার্লেমান)।

চতুর্থ অধ্যায়

১। রোম সাম্রাজ্যের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখাও ঃ

রোম, কনস্টাণ্টিনোপল, পূর্ব রোম সাম্রাজ্য, পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য, জেরুসালেম, আলেকজান্দ্রিয়া, কার্থেজ, স্পার্টা, এথেন্স।

২। কোন্ রোম সম্রাট খ্রীষ্টান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে মেনে নেন? তার রাজত্বকালের প্রধান কীর্তি কি?

৩। রোম সাম্রাজ্যকে কে দুভাগে ভাগ করেন ও কেন?

৪। সম্রাট জাস্টিনিয়ান যে সব অঞ্চল দখল করেছিলেন সেগুলি মানচিত্রে দেখাও।

৫। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? তাঁর রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও।

৬। জাস্টিনিয়ান কিভাবে আইন সংহিতা প্রণয়ন করান? আইন সংহিতার বৈশিষ্ট্য কি? জাস্টিনিয়ানকে 'সভ্য সমাজের আইন প্রণেতা' বলা হয় কেন?

৭। জাস্টিনিয়ান কনস্টাণ্টিনোপলকে কিভাবে নতুন করে গড়ে তোলেন? তাঁর স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে কি জান?

৮। জাষ্টিনয়ান চিত্রশিল্পের কিরূপ পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদার ছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখ।

৯। কনস্টাণ্টিনোপল কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে? কনস্টাণ্টি-নোপলকে তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র বলা হয় কেন?

১০। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে কনস্টাণ্টিনোপলের বর্ণনা দাও।

১১। যথোপযুক্তভাবে জুড়ে দাও ঃ

(ক) বেলিসেরিয়াস	কে 'সভ্য সমাজের আইন প্রণেতা' বলা হয়।
(খ) জাস্টিনিয়ান	ছিলেন প্রতিভাশালী সেনাপতি।
(গ) প্রকোপিয়াস	বাইজেণ্টিয়ামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।
(ঘ) কনস্টাণ্টাইন	ছিলেন চিকিৎসক ও জাস্টিনিয়ানের সভাসদ।
(ঙ) এটিয়াস	ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক।

পঞ্চম অধ্যায়

১। মহম্মদের জন্মের পূর্বে আরবদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিবরণ দাও।

২। হজরত মহম্মদের জীবনী ও বাণী সংক্ষেপে লিখ।

৩। মহম্মদ মক্কায় ইসলাম ধর্ম কি ভাবে প্রচার করেন? বদরের যুদ্ধ কেন বিখ্যাত?

৪। ইসলাম ধর্মের সার কথা কি?

৫। ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসারের কারণ কি?

৬। 'খলিফা' কথাটির অর্থ কি? খলিফাদের রাজত্বের বিবরণ দাও।

৭। কর্ডোভা কোথায় অবস্থিত? স্পেনের আরবদের কি বলা হয়? কর্ডোভা সম্বন্ধে কি জান?

৮। ইসলামের সাফল্যে ইউরোপে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?

৯। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবদের অবদান কিরূপ?

১০। কয়েকজন বিখ্যাত আরব পণ্ডিতে নাম লেখ এবং তাঁরা কিজন্য বিখ্যাত তা উল্লেখ কর।

১১। নীচের বাক্যগুলিতে কিছু ভুল তথ্য আছে; ঠিক করে লেখ ঃ

(ক) আব্বাসীয় খলিফাদের সাধু খলিফা বলা হয়। (খ) স্পেনে আরবদের রাজধানী ছিল গ্রানাডা। (গ) হুনাইন ছিলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। (ঘ) অলতবারী রচিত পুস্তকের নাম 'তারিখ-অল-হিন্দ'। (ঙ) ইবন রসিদ অভি সেন্না নামে পরিচিত।

১২। যথোপযুক্তভাবে জুড়ে দাও ঃ

(ক) হারুন অল রসীদ	স্পেনে আরব স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
(খ) আলহামব্রার সিংহপ্রাসাদ	উমায়া বংশীয় খলিফা।
(গ) হুনাইন ছিলেন	তারিখ-অল-হিন্দ গ্রন্থের লেখক।
(ঘ) অলবিরুণী ছিলেন	অনুবাদের সম্রাট।
(ঙ) অল-হাইলাম ছিলেন	চিকিৎসক ও দার্শনিক।
(চ) ইবন সিনা ছিলেন	বিজ্ঞানী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। শার্লেমান কিভাবে ফ্রাঙ্ক রাজ্যের অধীশ্বর হন ?

২। শার্লেমানের অভিষেক ক্রিয়ার গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

৩। শার্লেমানের অভিষেককে মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা হয় কেন ?

৪। শার্লেমানের সঙ্গে খ্রীষ্টান চার্চের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

৫। শার্লেমানের রাজসভায় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ কিভাবে ঘটে ?

৬। শার্লেমান শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি করেছিলেন তা সংক্ষেপে লেখ।

৭। মধ্যযুগের মঠে বিভিন্ন প্রকার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পরিচয় দাও।

৮। মধ্যযুগের ইউরোপে মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবন কিরূপ ছিল ?

৯। 'বেনেডিক্‌টিন শপথ' কাকে বলা হয় ?

১০। 'ক্লুনি সংস্কার' কাকে বলা হয় ? ক্লুনি সংস্কার দ্বারা কিভাবে মঠের জীবনের পরিবর্তন আনা হয় ?

১১। ক্লুনি সংস্কারের ফলে চার্চের সঙ্গে রাজশক্তির বিরোধ দেখা দিল কিভাবে ?

১২। ইনভেস্টিচার কনটেস্ট বলতে কি বোঝ ?

১৩। একাদশ ও দ্বাদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৪। ক্যাথিড্রাল স্কুল হতে বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে গড়ে উঠেছিল ?

১৫। মধ্যযুগের মঠগুলিকে শিক্ষাদীক্ষার প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কেন ?

১৬। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক কেমন ছিল ? ছাত্রেরা কিসের ওপর নির্ভর করে পরীক্ষা দিত ?

১৭। মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার প্রসার কিভাবে ঘটে ?

১৮। সঠিক উত্তর খুঁজে বের কর ঃ

(ক) শার্লেমানের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (৭৯৯, ৮০০, ৮২২ খ্রীষ্টাব্দে)।

(খ) শার্লেমানের জীবন-চরিত লেখকের নাম (আলকুইন, পল, পিটার, আইনহার্ড)।

(গ) মণ্টে ক্যাসিনো মঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (ডেকনের পল, অগাষ্টিন, তৃতীয় লিও, সেণ্ট বেনেডিক্ট)।

(ঘ) ক্লুনি মঠটি অবস্থিত ছিল (জার্মানীতে, ইটালীতে, ফ্রান্সে)।

১৯। প্রথম সারি ও দ্বিতীয় সারির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সাজাও ঃ

(ক) শার্লেমান	পোপ।
তৃতীয় লিও	প্রথম পবিত্র রোমান সম্রাট।
থিওডলফ	ঐতিহাসিক।
পল	কবি।
নানারি	মণ্টে ক্যাসিনো মঠের প্রতিষ্ঠতা।
বেনেডিক্ট	সন্ন্যাসীদের মঠ।
(খ) পিটার আবেলার্ড	প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী।
আলবার্ট ম্যাগনাস	প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
রজার বেকন	চিকিৎসাশাস্ত্র শেখানোর কেন্দ্র।
টমাস একুইনাস	ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।
সালার্নো	আইনশাস্ত্র শেখানোর শ্রেষ্ঠ স্থান।
বোলোনা	বিখ্যাত দার্শনিক।
প্যারিস	মহাপণ্ডিত।

২০। নীচের ধাঁধাটি থেকে যে কোন তিনজন বিখ্যাত লোকের নাম খুঁজে বের কর। এঁদের বিষয়ে অন্ততঃ দু-লাইন লেখ ঃ

মা ট স এ না ই স কু বে ক ট ডি নে ল আ ন ই ক ন ব জা র

সপ্তম অধ্যায়

১। সামন্ত প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। মধ্যযুগে সামন্তদের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। 'হোমেজ' কাকে বলা হয়? 'হোমেজ' অনুষ্ঠানটির বর্ণনা দাও।

৫। সামন্ত যুগের দুর্গগুলির বর্ণনা দাও।

৬। মধ্যযুগের সিভ্যালির প্রথা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। 'নাইট' কাদের বলা হত? 'নাইট' অভিষেক অনুষ্ঠানটি বর্ণনা কর।

৮। মধ্যযুগে বর্মপরিহিত সৈন্যদল কিভাবে শত্রুর আক্রমণ হতে সমাজকে রক্ষা করত?

৯। ত্রুবেদুর কাদের বলা হত?

১০। 'ম্যানরীয় পদ্ধতি' কাকে বলে? ম্যানরীয় ব্যবস্থায় জমিদার ও কৃষকের সম্পর্ক বর্ণনা কর।

১১। ম্যানর বিচারালয়ের বিচারের কাজ কিভাবে হত?

১২। ম্যানরে কিভাবে চাষ আবাদ হত নক্সার সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

১৩। 'কর্ভি" বা বেগার প্রথা বলতে কি বোঝ?

১৪। ম্যানর ব্যবস্থায় চাষীদের দায়-দায়িত্ব কিরূপ ছিল উল্লেখ কর।

১৫। ম্যানরে জমিদারদের জীবনযাত্রা সংক্ষেপে লেখ।

১৬। ম্যানরে চাষীদের জীবন কিরূপ ছিল?

১৭। ম্যানরীয় দুর্গে জমিদারদের জীবনযাত্রর বিবরণ দাও।

১৮। সামন্ত যুগে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পরিচয় দাও।

১৯। ভূমিদাস প্রথা কিভাবে দেখা দেয়? ভূমিদাস হতে মুক্তির কি কি উপায় ছিল তা উল্লেখ কর।

২০। সামন্ত ও চাষীদের জীবনযাত্রায় কি কি পার্থক্য ছিল?

২১। সঠিকভাবে সাজাও ঃ

(ক) ডিউক, সামন্ত রাজা- আর্ল, নাইট, ব্যারণ।

(খ) ঠিক উত্তরটিতে দাগ দাও ঃ

সামন্ত রাজারা সৈন্য পেতেন— চাষীদের নিকট হতে, ধর্মযাজকদের নিকট হতে, সামন্তদের নিকট হতে।।

(গ) লর্ড অধস্তনের নিকট হতে যে অর্থ নিতেন তাকে বলা হত—কর, সাহায্য, সেবা করার একটা দিক।

(ঘ) মাথাপিছু করের নাম—ওয়ার্ডশিপ, কর্ভি, হেরিয়ট।

(ঙ) সিভ্যালরি শিক্ষা শুরু হত– চার্চে, মনাস্টিক স্কুলে, প্রাসাদ-সংলগ্ন স্কুলে, সামন্ত দুর্গে।

অষ্টম অধ্যায়

১। 'ক্রুসেড' কাকে বলে? এরূপ নাম হওয়ার কারণ কি? ক্রুসেড কতদিন চলেছিল?

২। ক্রুসেড কেন এবং কিভাবে সুরু হয়েছিল আলোচনা কর।

৩। ক্রুসেডে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লেখ।

৪। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। ক্রুসেডের ফলাফল উল্লেখ কর।

৬। ক্রুসেডের ফলে শহরগুলির ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পায়? ক্রুসেডের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে কিভাবে?

৭। ক্রুসেডের ফলে কৃষিকর্ম হতে হস্তশিল্প কিভাবে পৃথক্ হয়ে গেল তার বিবরণ দাও।

৮। প্রথম সারির ও দ্বিতীয় সারির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সাজাও ঃ

১০৯৫ খৃীঃ	তৃতীয় ক্রুসেড
১১৮৭ „	প্রথম ক্রুসেড
১২৯১ „	চতুর্থ ক্রুসেড
১২০১ „	ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি
পিটার	পবিত্র রোম সম্রাট
প্রথম রিচার্ড	ফ্রান্সের রাজা
দ্বিতীয় ফিলিপ	ইংলন্ডের রাজা
দ্বিতীয় ফ্রেডারিক	সন্ন্যাসী

৯। যে বক্তব্যটি তোমার নিকট ঠিক বলে মনে হয় তাতে দাগ দাও ঃ কৃষিকর্ম হতে হস্তশিল্প বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কারণ

(ক) কৃষিকর্ম করতে অনিচ্ছা।

(খ) কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস।

(গ) হস্তশিল্পে বেশি রোজগারের আশা।

(ঘ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি।

নবম অধ্যায়

১। মধ্যযুগে শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ কিভাবে ঘটে?

২। বণিক ও শিল্প সংঘের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৩। মধ্যযুগের শহরের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল?

৪। মধ্যযুগের শহরগুলি কিভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে ?

৫। শিল্প সংঘগুলি থেকে কিভাবে মিউনিসিপ্যাল স্কুল গড়ে ওঠে ?

৬। 'বুর্জোয়া' কথাটির সঠিক অর্থ কি ? সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছিল ?

৭। মধ্যযুগের শহরের সমাজ কিরূপ ছিল ? এই সমাজে কর্তৃত্ব করত কারা ?

৮। শহরের জীবন ও ম্যানরের জীবনের প্রকৃতির মধ্যে কি কি পার্থক্য খুঁজে পাও ?

৯। শহরের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সামঞ্জস্য করে লেখ ঃ

ডিউক কাউণ্ট নামধারী সামন্তরা নির্মাণ করেছিলেন	ট্রেড গিল্ড
শহরের বণিকরা নিজেদের সুবিধার জন্যে একটি করে সংঘ স্থাপন করে। এর নাম	বুর্গ
শিল্প সংঘের প্রধানকে বলত	জার্নিম্যান
শিক্ষানবিশী শেষ হলে কারিগরদের বলা হত	সর্দার কারিগর
শহরের সমাজে প্রথম শ্রেণী ছিলেন	অদক্ষ শ্রমিক
এর পর সমাজে গণ্যমান্য ছিলেন	ব্যবসায়ী, বণিক, শিল্প সমিতির প্রধানরা
সমাজে সবচেয়ে নীচে যাদের স্থান ছিল তারা ছিল	দক্ষ শিল্পী, কারিগর

দশম অধ্যায়

[ক]

১। তাঙ যুগে চীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। তাঙ যুগে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন আনা হয় ?

৩। তাঙ যুগে শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে কি জান ? সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঙ যুগকে 'কবির যুগ' বলা হয় কেন ? এই যুগের দুজন বিখ্যাত কবির নাম লেখ।

৪। তাঙ যুগে চীনা চিত্রশিল্পের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল ? এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কিরূপ হয়েছিল ?

৫। তাঙ যুগে চীনে বৌদ্ধধর্মে কি পরিবর্তন দেখা দেয়? তাঙ যুগের চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর কোন্ কোন্ দেশে ছড়িয়ে পড়ে?

৬। হিউয়েন সাঙ-এর ভারত পরিভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

৭। তাঙ বংশের পর কোন্ বংশ চীনে রাজত্ব করে? এই বংশের যোগ্য কীর্তির বিবরণ দাও।

৮। সুঙ যুগে যে সব ক্ষেত্রে সংস্কার আনা হয় তা বর্ণনা কর।

৯। সুঙ যুগ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার প্রবর্তন করা হয়?

১০। ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কি করা হয়েছিল?

১১। সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুঙ যুগে চীন কিরূপ উন্নতি করেছিল? চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে এ যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হয় কেন? কয়েকজন চিত্রশিল্পীর নাম লেখ।

১২। চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মঙ্গোলরা কিভাবে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে?

১৩। কুবলাই খান কিভাবে চীনের সম্রাট হন? তাঁর শাসনকাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

১৪। মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে চীন সম্বন্ধে যা জানা যায় তা বর্ণনা কর।

১৫। মানচিত্রে মার্কো পোলোর ভ্রমণপথ ও কুবলাই খানের সাম্রাজ্য দেখাও।

১৬। নীচের বাক্যগুলি কিছু ভুল আছে। ঠিক করে লেখ।

(ক) লু-ই তাঙ ছিলেন সুঙ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। (খ) লি-পু আর তু-ফু সুঙ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার। (গ) সুঙ আমলে সমগ্র চীনকে ১৫টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। (ঘ) উ-ইয়ু ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি। (ঙ) চাঙ কুয়াঙ ইন ছিলেন তাঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। (চ) মি-ফি ছিলেন সুঙ যুগের প্রবন্ধকার। (ছ) কুবলাই খানের আসল নাম তেমুজিন। (জ) মার্কো পোলো সুঙ যুগে চীনে যান। (ঝ) 'লামা' কথাটির অর্থ সন্ন্যাসী।

১৭। যথোপযুক্তভাবে জুড়ে দাও ঃ

চ্যাং-আন	কুবলাই খানের রাজধানী।
পিকিং	তাঙ রাজাদের রাজধানী।
লুঙ-ওয়েন কুয়ান	মর্তে দেবদূত।
লি-পু	সাহিত্যের স্কুল।
যু-মা-কুয়াং	সুঙ যুগে ঐতিহাসিক।

১৮। সময়ানুক্রমিক সাজাও ঃ—

কুবলাই খান, তাই-সুঙ, চাও-হুয়াং-ইন, মিঙ হুয়াঙ, ওয়াং, ইন সুঙ।

[খ]

১। মধ্যযুগে জাপানের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও।

২। শোটোকু সংস্কারের দ্বারা জাপানে কি সংস্কার করতে চাওয়া হয়েছিল ?

৩। জাপানে তাইকো যুগে কি কি পরিবর্তন আনা হয় ?

৪। হেইয়ান যুগে জাপানে যে পরিবর্তন আসে তা বর্ণনা কর।

৫। জাপানে শোগানদের ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পায় তা বর্ণনা কর।

৬। 'সামুরাই' কাদের বলা হত এবং সামুরাইদের শিক্ষা কিভাবে পরিচালিত হত তা আলোচনা কর।

৭। সঠিক উত্তর খুজে বের কর ঃ—

(ক) আমাতেরাসু বা সূর্যদেবীর পূজা প্রচলিত হয় (কোরিয়া হতে, চীন হতে, সম্রাটের পরিবার হতে)।

(খ) শোটোকু সংস্কারের সাথে মিল ছিল (সুঙ যুগের, ইউয়ান যুগে, তাঙ যুগের অনুশাসনের)।

(গ) জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে চীনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় (হেইয়ান যুগে, শোগান শাসনকালে, তাইকো যুগে)।

(ঘ) হেইয়ান যুগের প্রথমদিকে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে (শোকনরা, মিনামোতো পরিবার, তাইরো পরিবার, ফুজিওয়ারা পরিবার)।

৮। যথোপযুক্তভাবে জুড়ে দাও ঃ

দাইমিয়ো	তলপেট চিঁড়ে মৃত্যুবরণ করা
কামি	নতুন জমিদার
শোয়েন	উঁচু
শোকন	রণ ব্যবসায়ী
সামুরাই	ব্যক্তিগত জমিদারী
বুশীদো	জমিদারী তদারক করবার কর্মচারী
হারাকিরি	সামুরাইদের নীতি

একাদশ অধ্যায়

১। ভারতে হূন আক্রমণ ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

২। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা বর্ণনা কর।

৩। হর্ষবর্ধন কিভাবে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন ? তাঁর বিভিন্ন রাজ্যজয়ের বিবরণ দাও।

৪। ভারতের মানচিত্রে হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা এবং ভারতে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণপথ দেখাও।

৫। হর্ষবর্ধনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের পরিচয় দাও।

৬। হর্ষবর্ধনকে ভারত সম্রাট বা উত্তরাপথনাথ কেন বলা যায় না তা ব্যাখ্যা কর।

৭। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৮। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।

৯। হর্ষোত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দাও।

১০। রাজপুত জাতির উৎপত্তি কিভাবে ঘটে?

১১। গুর্জর প্রতিহার কারা? এঁদের রাজত্বের বিবরণ দাও।

১২। 'ত্রিশক্তি সংগ্রাম' বলতে কি বোঝ? ত্রিশক্তি সংগ্রামের বিবরণ দাও।

১৩। বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর পরিচয় দাও।

১৪। বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে? তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

১৫। পাল বংশ কিভাবে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এই বংশের রাজত্বের বিবরণ দাও।

১৬। বাংলার সেন বংশের শাসনকালের বিবরণ দাও।

১৭। পাল ও সেন যুগে বাঙলার সামাজিক জীবনের বিবরণ দাও।

১৮। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার কিরূপ হয়েছিল?

১৯। বাদামীর চালুক্যদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২০। কাঞ্চীর পল্লব রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২১। দক্ষিণ ভারতের চোল রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২২। (ক) সময়ানুক্রমিক সাও ঃ

মিহিরকুল, ললিতাদিত্য, মুক্তাপীড়, দেবপাল, হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক, রাজেন্দ্র চোল।

(খ) হিউয়েন সাঙ, ধর্মপাল, স্কন্দগুপ্ত তোরমান, লক্ষ্মণসেন, যশোবর্মন।

(গ) পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কর ঃ

ভারতের এটিলা	ধর্মপাল
বিক্রমশীলা	মিহিরকুল
মৌখরি	দ্বিতীয় পুলকেশী
চালুক্য	গ্রহবর্মা
মহাবলীপুরম	বল্লালসেন
কৌলিন্য প্রথা	পল্লব শিল্প
আজমীর	চৌলুক্য বংশ
মেবার	চৌহান বংশ
গুজরাট	গুহিলোট বংশ

দ্বাদশ অধ্যায়

১। মধ্যযুগে ভারতের সহিত স্থলপথে যে-সব দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা বর্ণনা কর।

২। মহাযান মতবাদ কাকে বলে? এই মতবাদ কিভাবে মধ্য এশিয়া হতে চীনে প্রসারলাভ করে তা সংক্ষেপে লেখ।

৩। খোটান রাজ্যটি কোথায় অবস্থিত? এখানে যে-সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেগুলি হতে কি জানা যায়? হিউয়েন সাঙ খোটান সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা সংক্ষেপে লেখ।

৪। চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কিভাবে ঘটে?

৫। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হয়? এই প্রসঙ্গে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অবদান উল্লেখ কর।

৬। জলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?

৭। কম্বোজ ও চম্পায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিস্তার সম্পর্কে লেখ।

৮। আংকোরভাট, আংকরটোম ও বরবুদুর কোথায় ও কেন বিখ্যাত?

৯। মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও বলিদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার কিভাবে ঘটে?

১০। শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১। সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও:

(ক) হিউয়েন সাঙ যখন খোটান যান সে সময় সেখানকার রাজা ছিলেন (অমর সিং, রণজিৎ সিং, বিজিত সিং)।

(খ) অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত গিয়েছিলেন, কারণ

(১) তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(২) দেশভ্রমণে উৎসাহী ছিলেন।

(৩) তিনি ধর্মীয় নেতা হিসেবে নাম করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

(৪) তিব্বতে রাজার আমন্ত্রণে সেখানে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করতে গিয়েছিলেন।

(গ) জ্ঞানপ্রভর রাজা ছিলেন (তিব্বতের, কুচার, তুরফানের, চীনের)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। মহম্মদ ঘোরী কিভাবে ভারতে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন ?

২। দিল্লীতে সুলতানী শাসন কিভাবে শুরু হয় ? শাসনকাল উল্লেখ করে সুলতানী বংশগুলির নাম লেখ।

৩। খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ? তাঁর রাজ্যবিস্তার ও শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও।

৪। তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ? তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

৫। সুলতানী যুগে রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও।

৬। সুলতানী আমলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৭। সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ফলে সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে কিরূপ রূপান্তর ঘটে ?

৮। ভক্তিবাদ বলিতে কি বোঝ ? এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব, নানক ও কবীরের ধর্মমত সংক্ষেপে লেখ।

৯। ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী যুগে বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।

১০। সঠিক উত্তরে দাগ দাও ঃ

(ক) দিল্লীর সুলতানী শাসনের শুরু হয়—১১২৫, ১১০৮, ১১৪৫, ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে।

(খ) সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে—১২২১, ১৩৭৬, ১৪৯০, ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

(গ) সময়ানুক্রমিক সাজাও ঃ—

ইলতুৎমিস, মহম্মদ ঘোরী, কুতুবউদ্দিন, সুলতান মামুদ, মহম্মদ-বিন-তুঘলক, আলাউদ্দিন খলজী, গিয়াসুদ্দিন বলবন।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। কনস্টাণ্টিনোপলের পতন কিভাবে ঘটে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। কনস্টাণ্টিনোপলের পতন ইউরোপের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কেন ? কনস্টাণ্টিনোপলের পতন রেনেসাঁসকে কিভাবে সাহায্য করেছিল ?

৩। 'রেনেসাঁস' কথাটির অর্থ কি ? রেনেসাঁসের সূচনা কিভাবে হয় বর্ণনা কর।

৪। রেনেসাঁসের ফলে মানুষ আবিষ্কারের প্রেরণা কিভাবে পেয়েছিল সংক্ষেপে লেখ।

৫। মধ্যযুগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে চার্চের ধারণা কিরূপ ছিল ?

৬। রেনেসাঁসের ফলে জ্ঞানের সীমা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ?

৭। মধ্যযুগের শেষে স্বাধীন যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাব ও চিন্তার বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল ?

৮। মধ্যযুগের শেষে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিল ?

৯। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বিস্তার কিভাবে ঘটেছিল ?

১০। রেনেসাঁসের অগ্রদূত বলা হয় কাদের এবং কেন ?

১১। পোপের নেতৃত্বে ধর্মীয় ঐক্যের ধারণা নষ্ট হল কিভাবে ? জাতীয় রাষ্ট্রের চেতনা কিভাবে দেখা দেয় ?

১২। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব কিভাবে ঘটে ?

১৩। সঠিক উত্তর খুঁজে বের কর :

(ক) বাইজাণ্টাইন সম্রাট তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে ইটালীতে যাঁকে পাঠান তাঁর নাম হল—দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাসিও, চৌরিসোলেরাস।

(খ) 'ডিভাইন কমেডি'র লেখক হলেন (গ্যালিসিও, পেত্রার্ক, দান্তে)।

(গ) সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি যে ঘুরছে তা প্রথমে আবিষ্কার করেন (গ্যালিলিও, রজার বেকন, কেপলার, কোপার্নিকাস)।

(ঘ) ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকটে এসে পেঁছান—১৪৯২, ১৬৮৮, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

মধ্য যুগের
সভ্যতা